এখন ডুয়ার্স

১ সেপ্টেম্বর ২০১৬। ১২ টাকা

ডুয়ার্সের মেধা আজও 'আউটগোয়িং'?

শিক্ষক দিবসের আত্মসমীক্ষা

উদবোধনের অপেক্ষায় উত্তরের সেরা যুব আবাস

উত্তরের পাঠকের প্রশ্নোত্তরে উন্নয়নমন্ত্রী

মাছ চাষে সেরা তবু মাছের আকাল

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

বিজ্ঞাপনী মোড়ক দেখে বাপ-মা পড়ে বেজায় ফাঁসে
ধোপদুরস্ত ইং-জমানায় শিক্ষা গেছে বনবাসে!
পকেট থেকে ঢাললে কড়ি আসবে ডিগ্রি
তোমার পাশে
জ্ঞানের চর্চা হাসির খোরাক - শিক্ষা এখন বনবাসে!
সরকারী আর দরকারই নয় সেন্ট ছড়ানো স্কুলটি হাসে
পণ্য করার জন্য ছোটো - শিক্ষা গেছে বনবাসে!
মিড ডে মিলের হোটেল চলুক মন উদাসীন সিলেবাসে
স্যার ম্যাডামের রমরমা টোল - শিক্ষা গেছে বনবাসে!
হাজার হাজার পদ খালি থাক্ কার সেখানে কী
যায় আসে
ভাষণ হবে শাসন হবে - শিক্ষা যাবে বনবাসে!
বাংলা পড়ে লজ্জাতে লাল কুণ্ঠিত কেউ ভাষার ত্রাসে
দুই মিডিয়াম ঠোকাঠুকি - আসল শিক্ষা বনবাসে!
কলেজ ইউনি জমজমাটি রাজনীতিরই তুমুল চাষে
কোণঠাসা হয় সত্যি মেধা - শিক্ষা চলে বনবাসে!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- রিয়াজুল হক

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
টিচিং বনাম চিটিং ৪
ডুয়ার্সের মেধা আজও 'আউটগোয়িং' ৮
শিক্ষক দিবসে আত্মসমীক্ষা
'শিক্ষার প্রগতি' রাজনীতির পাঁকে থমকে ১২
উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার ১৬
রাজনীতির ডুয়ার্স
জলপাইগুড়িতে দিদির ভরসা সৌরভই ১৯
দূরবিন
উৎসব আসন্ন তবু চা বাগানে এখনও বিষণ্ন অনিশ্চয়তা ২১
পর্যটনের ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের অচেনা ত্রয়ী ২৪
উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় যুব আবাস ২৮
প্রতিবেশীর ডুয়ার্স
দক্ষিণ দিনাজপুর মাছ উৎপাদনে সেরা, তবু কেন মাছের আকাল ২৬
স্মৃতির ডুয়ার্স
ঘুম ভাঙে সাইরেনে ৩৫
পাঠকের ডুয়ার্স ৩৬
নজির জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা স্কুলের ৩৮
স্কুল ছাড়ার পঁচিশ বছর উদ্‌যাপন ৪০
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৩৭
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৯
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪৬
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৭
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩০
তরাই উৎরাই ৩৩
লাল চন্দন নীল ছবি ৪১
শ্রীমতী ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ ২৯
এবারের শ্রীমতী ৪৪

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/aaddaghar

মা নেমে আসছেন মাটিতে, মানুষের জন্য

জলপাইগুড়ি পৌরসভার আহ্বান

পুজো তো দোর গোড়ায় এখন। শহর লাগোয়া তিস্তার চর ছেয়ে গিয়েছে কাশের বনে। রঙিন নৌকোগুলি নীল আকাশে টাঙান সাদা মেঘের চাঁদোয়ার নিচে বয়ে যাচ্ছে সেই বনের দিকে। পুজো কমিটির সদস্যদের তৎপরতা তুঙ্গে। পুজোর দিনগুলিতে আনন্দে মেতে ওঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন পুরবাসী। রাজবাড়ির মন্দিরে তৈরি হচ্ছে মায়ের মূর্তি।

আর তৈরি হচ্ছি আমরা। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রতিনিধি, কর্মীরা। পুজো মানেই মানুষের ঢল। তার আগে শহরের প্রতিটি রাস্তাকে বেশি উপযুক্ত করে তুলতে হবে আমাদের। পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে পুর এলাকার প্রতিটি কোণ। পুজো উদ্যোক্তাদের আয়োজন যাতে সুষ্ঠু হয়, সে জন্য বাড়িয়ে রাখতে হবে সহযোগিতার হাত। বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে ঘাট।

মা নেমে আসছেন মাটিতে, মানুষের জন্য। আমরা তাঁকে বরণ করার জন্য দিন গুনছি। পুরসভার পক্ষ থেকে রয়েছি সদা জাগ্রত। এবার পুজোয় মা আসবেন এক নতুন জলপাইগুড়ি শহরে। দেখবেন সার্থক পুর পরিষেবার চেহারা। আর পুরবাসী পুজোর দিনগুলিতে শহরের মন্ডপে মন্ডপে বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করবেন উন্নয়নের চিহ্নগুলি। আর এই ভেবে আনন্দিত হবেন যে, মা-মাটি-মানুষের হাতে পুরসভার দায়িত্ব তুলে দিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভুল করেন নি।

তাই এবারের শারদোৎসব শহরের প্রতিটি বিন্দুতে স্থাপিত থাকবে এক অদৃশ্য মঙ্গল ঘট। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পুরসভায় এর আগে আর কেউ এমন সর্ব মঙ্গলময় ঘট স্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু আমরা পেরেছি।

কারণ, আমরা মা-মাটি-মানুষের দর্শনে বিশ্বাসী। আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাশফুলের সাদা আর আকাশের নীল এনে ঢেলে দিয়েছেন দীর্ঘ কালের বঞ্চিত এই পুরসভায়। আমাদের কর্মবীণায় দিবারাত্র তাই ধ্বনিত হচ্ছে শরতের ললিত রাগিনী। সেই আলাপ ছড়িয়ে পড়েছে পুর এলাকার ২৫টি ওয়ার্ডে।

আলোর বেণু আজ সত্যিই বাজছে জলপাইগুড়ি শহরে। এই বেণু আপনারা যোগ্য হাতে তুলে দিয়েছেন বলেই এত সুর বাজছে। প্রতিটি ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠছে মায়ের মমতা, মাটির গন্ধ আর মানুষের বার্তা। আর পুর এলাকার আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে এই সংগীতে—

মা-মাটি-মানুষ পেতেছে তোমার যোগ্য আসনখানি।
এসে বসো মাগো! তুমি দশভুজা! আমাদের গিরিরানি।।

শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

টিচিং বনাম চিটিং

বছরে তিনশো দিন অফিস কামাই করা জনৈক বিপ্লবী ব্যাঙ্ক কর্মচারী একদিন এক শিক্ষক-পুত্রকে ব্যঙ্গ করে ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'টিচিং' আর 'চিটিং' নাকি একই ব্যাপার, কারণ দুটোর বানান একই, কেবল অক্ষর উলটোপালটা বসানো আছে! তরুণ শিক্ষক-পুত্রটি সে দিন যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছিল এবং পিতৃদেবকে নালিশ করেছিল সেই ব্যাঙ্ক কর্মচারীর নামে। পিতৃদেব শুনে হেসেছিলেন খানিক, ব্যাস। কিন্তু পুত্রের ক্রোধ তারপর অনেকদিন বজায় ছিল। একসময় সেই ক্রোধ অবশ্য স্তিমিত হল। কারণ এক, ততদিনে সেই ব্যাঙ্ক কর্মচারী নেতাটির প্রতাপ কোথায় যেন উবে গিয়েছে, তিনি তখন বাসে করে ১৫ কিলোমিটার দূরের গ্রাম্য ব্রাঞ্চে যাতায়াত করেন, কাজ শেষে ফিরতে রোজ রাত আটটা বেজে যায়। আর দুই, বহু চেষ্টা করেও, বহু নেতা ধরেও তিনি তাঁর মাস্টার ডিগ্রি করা ছেলেটিকে একটি শিক্ষকের চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেননি— অথচ তার চাইতে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন বন্ধুটি ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষক পদে জয়েন করে গিয়েছে। কানাঘুষোয় শুনেছে, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা নেতাকে গুঁজে দেওয়ার ফল নাকি হাতেনাতেই মিলেছে। ফলত ব্যাঙ্ক কর্মচারীটি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে আবার বলতে শুরু করেছে, টিচিং ও চিটিং সমার্থক।

শিক্ষক-পুত্রের অবশ্য এর পর আর শিক্ষক হওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি, একাধিকবার সুযোগ মেলা সত্ত্বেও। সে এক বড় শহরে গিয়ে কীসের এক দোকান খুলে ভালই আছে। তার পুত্র সম্প্রতি দুর্দান্ত রেজাল্ট করে আরেকটি শহরে একটি প্রথিতযশা কলেজে পড়তে গিয়েছে। সেই কলেজের বিতর্ক ক্লাসে প্রথম দিনের বিষয় ছিল— শিক্ষকদের মাইনে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ফলাফলের উপর হওয়া উচিত কিনা। পুত্রের কাছেই সে জানতে পারল, আমেরিকার কিছু জায়গায় নাকি এই প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। সেইসব স্কুলে স্থানীয় বোর্ড প্রত্যেক ক্লাসের প্রশ্নপত্র তৈরি এবং খাতা দেখার কাজটি করে। অবাক সেই শিক্ষক-পুত্রটি সে দিন ফোন রেখেই নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'ভাগ্যিস আমি শিক্ষক হইনি!'

'এখন ডুয়ার্স'-এর বিদগ্ধ পাঠক যাঁদের এই কলমটি পড়ার ধৈর্য আছে তাঁরা এই পর্যন্ত পড়ে এটিকে 'চমৎকার অণুগল্প' কিংবা 'ফালতু প্রলাপ' অভিহিত করতেই পারেন। কিন্তু একটা কথা সম্ভবত আজ কারুরই অস্বীকার করার উপায় নেই— 'শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড' অভিধায় ভূষিত করার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই ভারত সন্তানটি নিশ্চয়ই সেদিন ভেবেছিলেন, শরীরের এত অঙ্গ থাকতে শিক্ষকের জন্য মেরুদণ্ড-ই বা কেন? আর যে জাতির উদ্দেশে একথা বলা হয়েছে সে জাতির আদৌ কি কোনওদিন মেরুদণ্ড ছিল?

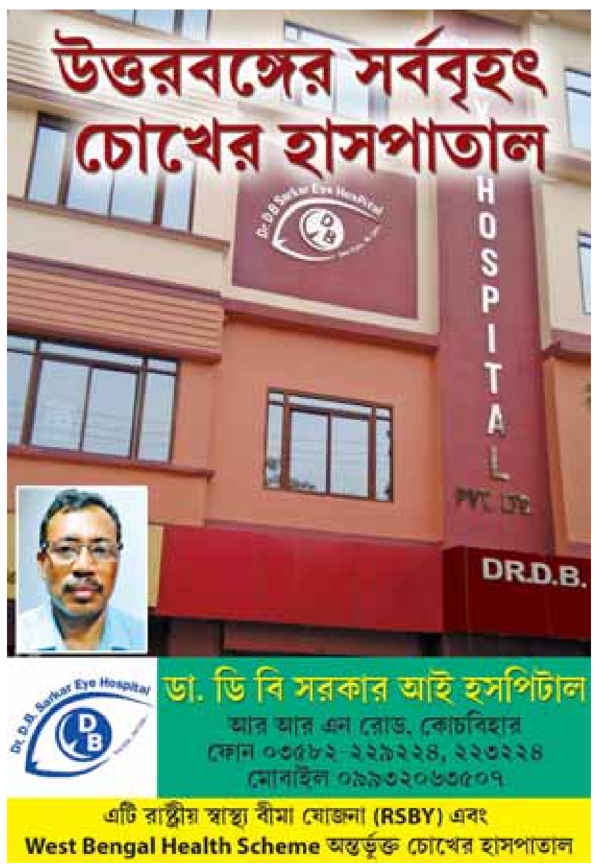

কলকাতায় হাত বাড়ালেই বন্ধু

একবার পা রাখলেই এই শহরের রূপ-রস-গন্ধ জড়িয়ে থাকবে আপনাকে, ভরিয়ে তুলবে আপনার মন। এখানে এক পলকের একটু হাসি দিয়ে হয় আলাপ, তারপর কথায় কথায় রাত গড়িয়ে ভোর। সময়ের সঙ্গে পা মেলানো দক্ষিণ, কিংবা ঐতিহ্যে উজ্জ্বল উত্তর - সব মিলিয়ে কলকাতা আছে কলকাতাতেই। ফুটপাথ-জোড়া পণ্যের পসরা, নস্টালজিক করে দেওয়া ট্রাম, ইতিউতি ছড়ানো আড্ডা দেওয়ার ছোট-বড় ঠিকানা — কলকাতার যেখানে যাবেন, যাকেই দেখবেন, মনে হবে যেন কতদিনের চেনা!

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

খুচরো ডুয়ার্স

যাচাই প্রবলেম

কানাঘুষোয় খবর পাওয়া যাচ্ছে, বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে যাঁরা আপৎকালীন বিবাহ করতে আসেন, তাঁদের বিবাহের

খ্যাটনের বন্দোবস্ত নাকি মন্দির কমিটিরই কাউকে কাউকে দেওয়া 'বাধ্যতামূলক'। তাঁদেরকে প্রয়োজনমতো বাজারটা করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তারপর আয়েশ করে কালো পোশাক পরিহিত 'লালবাবা' তাঁর প্রচলিত বাংলা মন্ত্রে বিবাহ অনুষ্ঠান সাঙ্গ করতে থাকেন, আর অপর প্রান্তে মন্দির কমিটির দায়িত্ববান রাঁধুনিরা রান্না করার নামে দরকারমতো আলুটা-ডালটা-পটোলটা-বেগুনটা, মায় চালও ২/৩ কেজি ভ্যানিশ করে দেন। এদিকে এতক্ষণ খালি পেটে বিয়ে করার পর যদি খাবারে টান পড়ে, তবে কার না মেজাজটা বিগড়ায় বলুন তো? কিন্তু এইসব জোচ্চুরির খবর নাকি মিছেই রটানো হচ্ছে বলে ভক্তদের দাবি। এসব নাকি দুর্জনদের কাজ। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করা দরকার। কিন্তু কে জানি বললে, 'যাচাই করতে গেলে তো আবার একখানা বিয়েও করতে হয় সেখানে।' হুম! তাও তা বটে!

পুণ্যে পাপ

পুণ্যার্থীরা পুজো দিতে এসেই থাকে। এতে নতুনত্বের কিছু নেই। তবে পুজো দিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই। এ ক্ষেত্রেও তা-ই দেখা যাচ্ছে মশাই। পুজো দিলেন পুণ্যের লোভে, আর ফিরলেন অহেতুক পাপের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। যার জেরে খবরের কাগজে অবধি নামখানা লিখিয়ে দিতে হল। ঘটনাটা সংক্ষেপে সারা যাক। শিলিগুড়ির জনৈক ব্যক্তি গিয়েছিলেন জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে। সকলেই যায়। কিন্তু তিনি বেচারা ফিরলেন ভগ্ন গাড়ি আর মন নিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনি বাড়িই পৌঁছাতে পারেননি প্রথম সুযোগে। ফার্স্ট স্টপ দিয়েছিলেন হাসপাতালে। অভিযোগের তর্জনী অবশ্য উঠে এসেছে পুলিশের দিকেই। বোঝো কাণ্ড! পুলিশ শুনলাম বেধড়ক পেঁদিয়ে গাড়ি-শরীর সব ভেঙে দিয়েছে। কারণ নাকি তুশ্চু রাস্তাজট! কী কাণ্ড! জল্পেশে জল ঢালার দিনে রাস্তায় তো জট হবেই। জল্পেশ রোড আর কতটুকুই বা চওড়া! আসলে কলি যুগ বলে কথা! বাবা জল্পেশ্বর যতই 'জাগ্রত' হোন না কেন, এ যুগে তাঁর চাইতেও জেগে থাকার লোকের অভাব নেই রে ভাই!

মাস্টার আর মাতাল

সে দিন শুনলাম ক্ষেত্রমোহন বিদ্যালয়ের মাস্টাররা রীতিমতো গুন্ডা হয়ে উঠেছেন। তাঁরা ফোল্ডিং মোড়ের এক চায়ের দোকানে জনৈক মাতালকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছেন বলেও খবর। কিন্তু পরে এক পরিচিত এবং তথাকথিত 'গুন্ডা' আখ্যা পাওয়া মাস্টার সাফ কথাটা শোনালেন। তাঁরা মোটেও লড়াইয়ের মেজাজে ছিলেন না। বেশ তো চা-পান এবং খেজুরে আলাপে মেতে ছিলেন। হঠাৎ নাকি কোত্থেকে এক উটকো মাতাল এসে খিস্তি দিতে শুরু করল আর তার জেরেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। মাতাল নাকি 'মাস্টার'দের গায়ে গরম চা-ও ছিটিয়ে দিয়েছিল। তবে মাস্টাররা বড়ই ভদ্র। মিছিমিছি তাঁরা 'গুন্ডা' আখ্যায়িত হয়েছেন বটে, তবে লড়াইয়ে নামেননি। চা-ওয়ালাই

মাস্টারদের 'ইনসাল্ট' দেখে আর স্থির থাকতে পারেননি। মাতালকে তাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশ দু'ঘা কষিয়ে দিয়েছিলেন তক্ষুনি তক্ষুনি! অবশ্যি প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মাস্টার বলে কি মানুষ না? ছাত্র ছেড়ে মাতালকে বেতের বাড়ি দেওয়াটা কি তাঁদের কর্তব্য ছিল না? তা-ই তো! পাবলিকের এই 'গুন্ডামি'তে সায় আছে দেখছি।

বুর্জোয়া টাইলস

কোটি টাকার ঝাঁ চকচকে টাইলস লাগানো আছে হে। তাও আবার হাঁটার জন্য। তবে সেখানে হাঁটাটা কিঞ্চিৎ দুরূহ হয়ে ওঠে বটে। মানে হাঁটার সময় টাইলস বসানো ফুটপাথটা ঠিক কোথায় আছে, সেটা খুঁজে খুঁজে বার করতে হয় তো! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ফুটপাথ দোকানের নিচে তলিয়ে গিয়েছে। আহা! শিলিগুড়ির মতো নগরীর পথে ফুটপাথ খুঁজে হাঁটা কি চাট্টিখানি কথা রে বাপ! কিন্তু কলকেতার দিকে চেয়ে দেখুন! পথিকের ফুটপাথ কেড়ে নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসাটা কি নগরীর 'স্পেশালিটি' নয়? কলকাতা কাল যা ভেবেছে, আজ তা শিলিগুড়ি ভাববে না কেন? মেয়র অশোকবাবুর 'শোক' সত্ত্বেও 'ফুট' পাতার জায়গা নেই পথিকের। এত্ত খরচা করে ফুটপাথ বানিয়েছে কি লোকের হাঁটার জন্যে? পথিকরা কোটি টাকার টাইলসে পা দিয়ে হাঁটবে আর হকাররা থাকবে ভাঙা ঘরে! ছি! মার্কস সাহেব শুনলে জ্ঞান হারাবেন না! যত্তসব বুর্জোয়া কথাবার্তা! গরিবদের বুঝি টাইলসের মেঝেতে দোকান বানাতে নেই!

গাছদেব

গাছের কাণ্ডে মনিষ্যির মুখ। পষ্ট দেখা যায় মুখমণ্ডল। দু'টি চোখ। দু'টি কান। দাঁত, মুখ, মায় পুরুষালি গোঁফটাও! অগত্যা ভগবান তো এর মধ্যে বাসা বাঁধবেনই। মানে উনি না চাইলেও গ্রামবাসীরা তাঁকে ছাড়বে কেন? সুতরাং দিব্যি পুজো-টুজো চলছে প্রতিবেশীর ডুয়ার্স মালদার এক গাঁয়ে। এই ইস্যুতে দুর্জনরাও বেশ টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছে। কিছু কিছু গল্পও রটেছে একে কেন্দ্র করে, যা সত্যিই রোমাঞ্চকর। যেমন ধরুন, কিছুদিন আগে নাকি এক কিশোর ওই শিমুল গাছের কাণ্ডে একজন লোককে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে-জাপটে থাকতে দেখেছে। কিশোর বেজায় ভয় পেয়ে তাকে পাথর ছুড়ে মারলেও লোকটি নাকি নট নড়নচড়ন। এর পর ছেলেটা চোঁ-চাঁ দৌড়। তারপরই নাকি গাছের গায়ে মুখমণ্ডল নিয়ে ভগবান নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে। মন্দ লোকরা অবশ্য

সাফ বলে দিয়েছে যে, গাছের গুঁড়ি কেটে এরকম মুখ বানিয়ে কেউ বা কাহারা গ্রামবাসীদের ভয়ানক বোকা বানাচ্ছে। তবে আমরা বিতর্কে জড়াব না বাপ। এসব অশৈলী, হিন্দুত্ব বিরোধী কথা বলে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা পেতে মোটেই রাজি নইকো!

চিতাকালচিনি

অনেকদিন পর একটা জম্পেশ খবর পাওয়া গিয়েছে। করবেট সাহেব থাকলে বড় খুশি হতেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে এখন তো আর সেসব দিন নেই, কাজেই মানুষখেকো চিতার আতঙ্কে রীতিমতো সিঁটিয়ে ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল ঘেরা কালচিনির রাজাভাতখাওয়া চা-বাগানের শ্রমিকমহল্লা। সে চিতা বেজায় সেয়ানা। সহজে ধরা তো দেবেই না, উলটে হাঁস-মুরগি ছেড়ে সে এখন মানুষের দিকে ঝুঁকেছে। শ্রমিকরা আর

চা-পাতা তুলতে যেতে চায় না। বনকর্তারাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাবি খাচ্ছেন চিতার সৌজন্যে। শ্রমিকদের দাবি, চিতা একটা নয়, অনেকগুলো। তবে মানুষখেকো এক-আধটা বড়জোর! বন আধিকারিকরা চা শ্রমিকদের নির্দেশ দিয়েছেন একসঙ্গে বড় দল বানিয়ে চা-পাতা তুলতে। এ যেন এক্কেরে 'চাঁদের পাহাড়'-এর প্রথম দিকের কাহিনির মতো। তবে চিতারা নাকি আবার বাংলোর বাথরুমে ঢুকে কী সব 'বড়বাইরে', 'ছোটভিতরে' সেরে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে! কিন্তু এর মধ্যে যাঁরা রাজনীতি খুঁজে পাচ্ছেন, তাঁরা কি চিতাদের ভোট পেয়েছিলেন? কে জানে! এখন ভালয় ভালয় মানুষখেকো চিতাটিকে পাকড়াও করতে পারলেই মঙ্গল।

কঙ্কালিত

'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে'— এমন একটা প্রবাদ বা চলতি কথার প্রচলন আছে তা নির্ঘাত জানেন। তবে আমরা এরই মধ্যে একটু রদবদল করে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছি। মানে মালদায় মাটি খুঁড়তে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে কি না। এবং ইস্যু পেলে যে পাবলিক স্টোরি তৈরি করতে ওস্তাদ তা তো ভালই জানেন। তো 'এর মধ্যে রাজনীতি টানবেন না'— এমন প্রতিশ্রুতি কেউ যেহেতু দেয়নি, তাই দুর্জন লোক, মন্দ লোক সকলেই উঠে-পড়ে লেগেছে। সুশান্ত ঘোষের কথাও উঠে গিয়েছে যথারীতি। শেষে জনৈক কাউন্সিলার ঘোষণা করেছেন যে, কঙ্কালিত স্থানটি একদা কবরখানা ছিল। তাই দু'-চারটে কঙ্কাল মিলতেই পারে। তাঁরা হাঁটাচলা না করলেই হল! ঠিক ঠিক! মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল পেলেই কেন সুশান্তর কথা তুলিস রে? মালদায় জোট সফল হয়েছে বলে?

হেলমেটাফিজিক্স

এত যে শুনছি হেলমেট ছাড়া বাইক চালালেই সিধে জরিমানা! সে গুড়ে তো বালি দাদা। হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী? 'নো হেলমেট নো পেট্রোল' বলে নাকি শিলিগুড়িতে জারি করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ, অথচ ভক্তিনগর থানার আশিঘর এলাকাতেই দিব্যি পুলিশের সামনে দিয়ে বিনা হেলমেটে ড্যাংড্যাং করে যাতায়াত করছে পাবলিক। বোঝো কাণ্ড! আর এরকম জঘন্য পরিস্থিতিতে চারদিক থেকে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছেন সাংবাদিকরা। জেরায় জেরবার কর্তব্যরত দু'জন পুলিশকর্মী। তাঁরা বেজায় হতোদ্যম হয়ে জানান যে, তাঁরা ট্রাফিক সামলাবেন, না হেলমেট ধরবেন? লোক নেই। তার মধ্যে আরও খবর যে, শিলিগুড়ির বেশির ভাগ স্কুলছাত্রী ও গৃহবধূ উইদাউট লাইসেন্সেই স্কুটি চালাচ্ছেন রমরমিয়ে। অথচ সবাই ফসকে ফসকে যাচ্ছে। তবে নিন্দুকরা সিন্দুকে যেহেতু বসে নেই, তাই তাদের বক্তব্য, পাবলিককে ওরা আর কী ধরবে হে, মাঝে মাঝে পুলিশকেও বিনা হেলমেটেই দেখা যাচ্ছে কিনা। সত্যি নাকি?

চা-বাগান ও নোবেল

ডুয়ার্সে চা-বাগানের সমস্যা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। এটা খোলে তো ওটা বন্ধ হয়। নেতারা আসেন। নেত্রীও। এই তো সে দিন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এলেন চামুর্চিতে। বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা

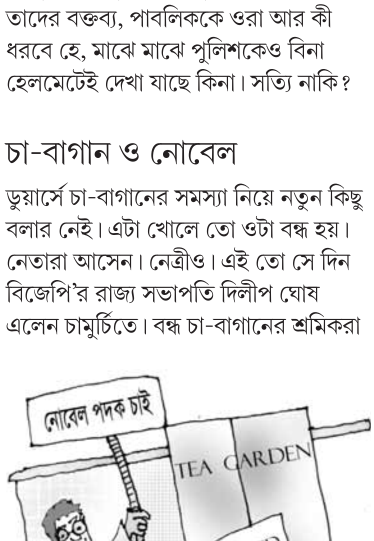

জড়ো হয়েছিলেন আশা-ভরসা নিয়ে, যদি দিলীপবাবু কিছু করতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রচুর এনার্জি নিয়ে রবি ঠাকুরের নোবেল চুরি নিয়ে পেল্লায় বক্তিমে রাখলেন। তার জন্যে দিদিকে তুলোধোনা করলেন। কেন রে দাদা! নোবেল চুরির কাহিনিটা অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের না বললেই কি চলছিল না? সে নোবেল উদ্ধার হলেই বুঝি চা-বাগানের সমস্যা মিটে যাবে? নোবেল পদকের সঙ্গে চা-বাগান বন্ধের কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য দিলীপবাবুকে নোবেল দেওয়ার দাবিও তুলেছেন বিরোধীরা। কেউ কেউ মুচকি হেসে বলছেন, 'আরে! উনি চা-বাগানে কী ফলে, সেটা জানেন তো?' সত্যিই জানেন তো? খুব জানতে ইচ্ছে করে।

দেশপ্রিয় রিবুট?

ডুয়ার্সের দেশপ্রিয় পার্ক হয়ে উঠতে পারে মাথাভাঙা। বিশ্বস্ত সূত্রে খবরাখবর যে, মাথাভাঙা সুভাষপল্লিতে এবার সর্ববৃহৎ দুর্গা তৈরি হচ্ছে। তারা এবার সকলকে ব্যাকফুটে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটছে। শুধু বড় প্রতিমাই নয় গো কর্তা! মাথাভাঙা এবার চন্দননগরের আলোকসজ্জাও রোশনাই ফেলবে। 'কী মজা হে তা ধিন ধিন/ মা আসতে আর তো ক'টা দিন।' তবে যতই নাচাকোঁদা হোক, ভিড় সামলানোর বন্দোবস্ত কি ভাল হবে? নাকি মাথাভাঙারও 'দেশপ্রিয়' পার্ক হয়ে ওঠার বেজায় সম্ভাবনা? আরে, ক'টা দিন সবুর করো না ভাই! রশুন তো সবে বুনেছে!

টুক্রাণু

কৃমি হত্যার বড়ি খেয়ে ডুয়ার্সের স্কুলপড়ুয়াদের কেউ কেউ সাময়িক ঘায়েল। গোরু চোরের তকমা পেল নেতার ভাইপো। ডুয়ার্সে যে কোনও প্রান্তে ভাঙা রেলিং নিয়ে শুয়ে থাকা সেতুর সংখ্যা বর্ধমান। মালদায় বাইক চুরি কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পাঁচ বছরেও কলেজ হস্টেল না হওয়ায় চেঁচামেচি আলিপুরদুয়ারে। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে পুনরায় জোর ধোঁয়াশা। প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে ফের চেঁচামেচি ডুয়ার্সে এবং প্রতিবারের মতো এবারেও আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা। বেলাকোবার জুনিয়র বি এড কলেজে ছাত্রদের সঙ্গে ছোট বাথরুম সারছে সাপেরাও। বন্ধু পেয়ে সারল হাতির রোগ। ডুয়ার্সের ডাক্তার এর নাম ঘোষণা করলেন 'ফ্রেন্ড থেরাপি'। চার মাস বন্ধের পর হুড়ুম করে খুলে গেল ডুয়ার্সের মানাবাড়ি চা-বাগান। দিনহাটার স্কুলে এম এ পরীক্ষার সিট পড়া সত্ত্বেও পরীক্ষাকালে মাইক বাজিয়ে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান।

গোড়ায় গলদ

বছর দুয়েক আগে জলপাইগুড়ি বাইপাসের ধারে একটি রেস্তরাঁর মনোরম পরিবেশে আলাপ হয়েছিল চারজন চল্লিশ পার হওয়া মানুষের সঙ্গে। তাঁদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়েই স্বতঃপ্রবৃত্ত আলাপ জমিয়েছিলাম। স্কুলজীবনে পরম ঘনিষ্ঠ চার বন্ধুর গেট টুগেদার। একজন দিল্লি থেকে বাগডোগরা হয়ে, পেশায় মহাকাশবিজ্ঞানী, দ্বিতীয়জন কানপুর থেকে এনজেপি হয়ে, এলাহাবাদের কাছে কোনও বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ান, তৃতীয়জন জলপাইগুড়ির অন্যতম ব্যস্ত চিকিৎসক এবং চতুর্থজন আলিপুরদুয়ারের একটি গ্রামীণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। চারজনই কোচবিহার জেলার একটি অখ্যাত স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পাশাপাশি বসে কাটিয়েছেন। এখন জীবনযুদ্ধে নানা দিকে ছিটকে গেলেও নাড়ির টান অনুভব করেন প্রতিনিয়ত, তাই বছর দশেক বাদে একরকম জোর করেই কয়েকটা দিন বার করেছেন স্কুলজীবনের মতো একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে ডুয়ার্সের পথে চষে বেড়াবেন বলে। আমার হাতে ক্যামেরা দেখে এবং ডুয়ার্সে আসবার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নেই জেনে কেউই অবাক হলেন না; বরং এক অদ্ভুত অনুরোধ করলেন, অন্তত একটা দিন দর্শক হিসেবে আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যান, পারলে কিছু ছবি তুলে দিয়ে যান অমূল্য মুহূর্তগুলোর।

বলাই বাহুল্য, এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায়নি, নানা কাহিনির লোভে। দেড় দিনের সেই সফরে যা দেখেছি, তাতে সত্যিই একটা আস্ত বই লিখে ফেলা যায়। মেধায় চারজনই কাছাকাছি ছিলেন, উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টও তা-ই। দু'জন উচ্চাকাঙ্ক্ষী থাকায় উচ্চশিক্ষার জন্য চলে গিয়েছিলেন কলকাতা ও দিল্লির কলেজে, বাকিরা উত্তরবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশোনা শেষ করেন। কলকাতা থেকে একজন চিকিৎসক হয়ে ফিরে আসেন, আর উত্তরবঙ্গ থেকে একজন দিল্লি চলে যান বিজ্ঞানী হওয়ার সুযোগ পেয়ে। কিন্তু সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, পড়াশোনায় উত্তরবঙ্গের ছাত্ররা পিছিয়ে ছিল, সেটা তাঁরা অনুভব করেছেন পদে পদে, অধ্যয়নের ভিত যথেষ্ট দুর্বল থাকায় বেগ পেতে হয়েছে নানা জায়গায়। তবে উত্তরবঙ্গে পড়াশোনা করে কিছু হবে না— এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না কেউই। কিন্তু প্রত্যেকেই সেই সময় অনুভব করেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করেছিল। এবং তা যথেষ্ট দ্রুত। আজ তারই ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গের দুই বন্ধু ছেলেমেয়ের কলেজের পড়াশোনা করার জন্য উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ভরসা রাখতে পারেননি, 'উত্তরের শান্ত আরামের জীবন ত্যাগ করে হাজার অসুবিধা স্বীকার করেও ওদেরকে কাটাতে হচ্ছে ঘর থেকে বহু দূরে।' বহুদিন বাদে বন্ধুমিলনের আনন্দ ভুলে খানিক বিষণ্ণ হয়েই বললেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 'ডুয়ার্সের ঘরে ঘরে আজ এরকম আরও অনেক বাবা-মা-ই এখন অক্ষম শঙ্কায় দিন কাটান, অথচ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎটাও একইরকম চিন্তায় রাখে তাঁদের।' প্রবাসী দু'জনও ভাগ করে নিলেন মনের কোণে লুকিয়ে রাখা গোপন দুঃখ, 'মাঝে মাঝেই মনে হয় দেশে ফেরার কথা, কিন্তু যতবারই ভেবেছি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথা ভেবেই পিছিয়ে গিয়েছি।' আর চিকিৎসক-বন্ধুর ম্লান সুর ইতি টেনেছিল সে দিনের আড্ডায়, 'আসলে তখন আমরা যতটা পিছিয়ে ছিলাম, পঁচিশ বছর বাদে একটুও এগতে পারিনি, পিছিয়েই পড়ছি ক্রমাগত।'

প্রাথমিক শিক্ষায় কুঠারাঘাত ও ফল অনুধাবন

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বোধহয় বাংলার প্রত্যন্ত এই ডুয়ার্সভূমি। সে সময় কলকাতার সঙ্গে ডুয়ার্সের ট্রেন যোগাযোগ ছিল বলতে গেলে

মাত্র একটিই— কামরূপ এক্সপ্রেস। সে সময় কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে কাগজ এসে পৌঁছাত পরদিন বিকেলে, কোনও কারণে ট্রেন না থাকলে (যা হামেশাই হত) আরও একদিন পরে। সে সময় ডুয়ার্স থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা যেত বঙ্গের দক্ষিণ দিকে পরীক্ষকদের কাছে, যাঁরা শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং বা কালিম্পং এসেছেন বড়জোর, বঙ্গভূমির এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছিল তাঁদের কাছে ছিল অজানা, গণ্ডগ্রাম। স্বভাবতই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় আতঙ্কিত মানুষ তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য ইচ্ছে থাকলেও বা সামর্থ্য থাকলেও তখন ইংরেজি বা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি যোগাযোগের ব্যবস্থা দুর্বল থাকায়। বলাই বাহুল্য, এর ফলে বঙ্গদেশের যেটুকু ক্ষতি হওয়ার হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই প্রত্যন্ত ভূমি।

উত্তরের সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগাযোগব্যবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটলে, বামপন্থীদের অনেকেই বুঝতে পারেন এর কুফল। এর সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে তোল্লা দেওয়ার পরিণাম ভুগতে শুরু করেন তাঁরা। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা পার্টি করার অজুহাতে স্কুলে না যাওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হলেন— সেই সুযোগে বাকিরা মন দিলেন কৃষি ও ব্যবসায়। শুনেছিলাম, সিপিএমের শিক্ষক সংগঠনের নেতা কোনও এক জেলার প্রাইমারি স্কুল বোর্ডের দায়িত্ব পেয়ে ঠিক করলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুশাসনে আবদ্ধ করবেন। শুরু হল তাঁর কড়া প্রশাসন, স্কুলে নিয়মিত না আসার শাস্তিবিধান, বদলি ইত্যাদি— যার কোনওটাই বোধহয় অন্যায্য ছিল না। স্কুলে স্কুলে আচমকা পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, স্কুল বাদ দিয়ে শিক্ষকরা বাড়ির দাওয়ায় বসে তাস খেলতে কিংবা বাজারে পাট বিক্রি করতে ব্যস্ত। তাঁর কড়া প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে খেপে উঠল পার্টি কর্মীরা, অবশেষে অপমানপূর্বক সেই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল তাঁকে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই আজন্ম বামপন্থী শিক্ষক সে দিন হেরে গিয়েছিলেন নিজের দলের তৈরি সিস্টেমের কাছে— তারপর আমৃত্যু একটাই ব্যথা বুকে নিয়ে কাটিয়েছেন, এই প্রত্যন্ত ভূমিতে মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই যখন সম্ভব নয়, তখন প্রগতির প্রশ্নই নেই। ক্ষমতায় যে কোনওভাবে টিকে থাকাটাই আসল উদ্দেশ্য।

বলাই বাহুল্য, সেই ট্র্যাডিশন আজও বয়ে চলেছে নতুন প্রজন্মের সরকার। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষকতাটুকু বাদ দিয়ে দিনভর যদি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন (এমনকি সাংবাদিকতাতেও) তাহলে দোষের কিছু নেই। আজ প্রাথমিক শিক্ষায় রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থা তারই পরিণাম।

শিক্ষকদের রাজনীতি এবং গুণগতমানের অবনতি

কিছুদিন আগে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটি স্পেশাল স্টোরিতে চোখ আটকে ছিল। মধ্যশিক্ষা ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অনেক বেশি পরিমাণে আর্থিক সাহায্য, সুবিধা ও শিক্ষকদের বেতন অনেকাংশেই বাড়ানো সম্ভব। শর্ত কেবল একটাই, শিক্ষকরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বা ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। একটা সময় শিক্ষকরা এ রাজ্যে তাঁদের হতদরিদ্র পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আন্দোলনে নেমেছেন, সেই সুযোগ নিয়ে তাঁদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয় রাজনীতির ময়দানে। এর বেশ কিছু পরেই তার প্রত্যক্ষ ফল মেলে দু'টি। এক, শিক্ষকদের ক্লাস করার সময়, ইচ্ছে ও অভ্যাস কমতে থাকে। ফলে হতাশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। দুই, পার্টি করলে শিক্ষকতার চাকরি জোটে— এটি প্রমাণিত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। একেই মেধাবী ছাত্ররা ইতিমধ্যেই কলকাতা বা অন্য রাজ্যের কলেজে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়িয়েছে, তারপর পার্টির প্রভাব। ফলত, এইসব প্রত্যন্ত এলাকায় পরবর্তীকালে শিক্ষকতার জন্য পড়ে থাকত মাঝারি বা নিম্নমেধার ছাত্রছাত্রীরা— যার পরিণামেই দেখা দিয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের সুশিক্ষার অভাব।

'আজ শিক্ষকদের চাকরি শৃঙ্খলিত ও মেধাভিত্তিক করার জন্য সার্ভিস কমিশন তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সঠিক ইংরেজি জানা শিক্ষক আপনি জেলা ধরে ধরে খুঁজে পাবেন ক'টা?' আক্ষেপের সুর শোনা যায় অবসরপ্রাপ্ত এক অশিক্ষক-কর্মীর কথায়। 'যাও দু-একটা পাবেন, তাঁরা সব ধরাছোঁয়ার বাইরে— বাড়িতে ছাত্রছাত্রীর টিউশন নিতে আসার ভিড়, স্কুলে গিয়ে পড়াবার সময় তাঁরা কতটুকুই বা পান?' তারই ব্যাখ্যা, গত তিন-চার দশকের শিক্ষার অভাব উত্তরের প্রত্যন্ত জেলাগুলির কোমর ভেঙে দিয়েছে। একদিকে যেমন শিল্প নেই, কৃষি নেই, অশিক্ষিতরা ভিন রাজ্যে যায় শ্রমিকের কাজে। অন্য দিকে তেমনই শিক্ষা নেই, শিক্ষক নেই, শিক্ষিতরাও একই রকমভাবে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কাজের খোঁজে। যাঁরা পড়ে আছেন, তাঁদের উপায় নেই, মোটামুটি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের ঝান্ডার নিচে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কলেজ রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও বুড়ো ঘোড়াদের অনুপ্রবেশ

আটাশ বছর আগের কথা বলি। উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি কলেজের নির্বাচনে বিরোধী দল ছাত্র পরিষদকে মনোনয়নপত্রই তুলতে দিল না তখনকার ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। বাইরের হাত-কাটা নাক-কাটা অচেনা সশস্ত্র বাহিনী এসে কলেজ ঘিরে ফেলল, বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করে গেল বিরোধী ছাত্রদের— পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে

কী বলছেন ডুয়ার্সের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা ?

ডুয়ার্সের ভাল রেজাল্ট করা ছেলেমেয়েদের বাইরে পড়তে চলে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। আমি একটা দিক তুলে ধরতে চাই। আগে চা-বাগানের বাবুদের ছেলেমেয়েরা বাগানের স্কুলেই পড়ত। তারপর বাগানের গাড়িতে চেপে কাছাকাছি উচ্চবিদ্যালয়ে যেত পড়তে। তখন বাগানবাবুরা সপরিবারে বাগানে থাকতেন। ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি শহরের স্কুলে পড়লেও ছুটিছাটায় বাগানে ফিরে আসার জন্য মুখিয়ে থাকত। কিন্তু এখন বাগানবাবুরা একাই বাগানে থাকেন। নিজে রান্না করে খান। পরিবার থাকে শিলিগুড়িতে। সন্তানরাও শিলিগুড়ির নর্থ-ইস্ট-ওয়েস্ট- সাউথ ইত্যাদি নানা ‘পয়েন্ট’-এ পড়ে। শিলিগুড়ির ইংলিশ মিডিয়ামের প্রতি তাঁদের অনেক ভরসা। তারপর কলকাতা বা রাজ্যের বাইরে তো বটেই।

হয়ত যোগাযোগের উন্নতি, ডুয়ার্সে পরিকাঠামোর অভাব ইত্যাদি কারণে বাগানবাবুদের সন্তানরা আর ডুয়ার্সে পড়াশোনা করতে আগ্রহ বোধ করে না। চা-বাগানের জীবন তাদের কাছে ‘বোরিং’। আগে বাগানের শিক্ষিত প্রজন্ম বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে থাকত বাগানে। এখন সেসব দিন ফুরিয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ডুয়ার্সে উচ্চশিক্ষার কোনও ভবিষ্যৎ খুঁজে পাচ্ছে না এ প্রজন্মের পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকরা। মেধাবীরা ছুটছে রাজ্যের বাইরে, নিদেনপক্ষে কলকাতায়। সাধারণ পড়ুয়ারা ছুটছে শিলিগুড়িতে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনার দরকার আছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা ভাল রেজাল্ট করেন, তাঁরা বাইরে চলে যান। কারণ এদিকে সুযোগ কোথায় ? প্রথাগত এম এ কিংবা এম এসসি ছাড়া ডুয়ার্সে আর বিশেষ সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আর্টস, সায়েন্স ইত্যাদি সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বাকি বিশ্ববিদ্যালয় যা স্থাপিত হয়েছে, সেখানে আর্টস ছাড়া আর কিছুই পড়ানো হয় না। এই সে দিন পর্যন্তও ছিল একটাই মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও একটা। কাজেই বাইরে চলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে অবশ্য কেউ কেউ ফিরে আসেন। কিন্তু সেটা আলাদা ব্যাপার। তাই সামর্থ্য থাকলে অভিভাবকরা কলকাতা কিংবা রাজ্যের বাইরে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে পাঠান। আমার দীর্ঘ শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই দেখে আসছি। কেবল ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার নয়, যাঁরা ভাল ছাত্র হিসেবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেতে চাইছেন, তাঁরাও বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই পছন্দ করছেন।

অর্ণব সেন

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বাইরে চলে যাওয়াটা অনেক দিনের ট্র্যাডিশন। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা বাইরেই পড়াশোনা করেছেন। এখন একটু সামর্থ্য থাকলেই সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ, আমার মতে, এ রাজ্যে শিক্ষার সেই পরিবেশ এবং পরিকাঠামো আর বজায় নেই। বাম-আমলে এই রাজ্যের শিক্ষার পরিবেশ ক্রমাগত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলেও কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। আমার মতে, ডুয়ার্সের তথা উত্তরবঙ্গের ভাল ছাত্রছাত্রীরা কলকাতাকে প্রথম পছন্দের তালিকায় রাখেন না। তাঁরা বাইরের রাজ্যেই যেতে চান। তা না হলে কলকাতা। তবে কেবল ডুয়ার্স নয়, গোটা রাজ্যেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ থেকে আশু মুক্তির সম্ভাবনা দেখছি না।

উমেশ শর্মা

দাঁড়িয়ে রইল সারাদিন। বিকেলে ওয়াকওভার পেয়ে গেল এসএফআই। দিনকয়েক বাদে বিষয়টি স্পষ্ট হল— সে বছরই ছিল কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপন, সেই উদ্দেশ্যে রক্ষিত বড়সড় ফান্ডে যাতে কারও হাত না পড়ে, সেই জন্যই এই বলপূর্বক ইউনিয়ন দখল। আরও জানা গেল, কলেজের ছাত্র নেতারা তো বটেই, জেলাস্তরের কয়েক নেতাও এর সঙ্গে জড়িত।

আজ যখন কলেজে কলেজে এই ধরনের ঘটনা শুনতে পাই, তখন বোধগম্য হয়— সে আমলে যে পথে কলেজ রাজনীতি চলত, আজও তা অপরিবর্তিত আছে। পদ্ধতিগত পরিবর্তন কিছু হয়নি, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র। সে সময়ই দেখেছিলাম মূল সংগঠনের নেতাদের ছাত্র সমাবেশের মঞ্চ আলো করে বসে থাকতে, কলেজে ছাত্রদের ছোটখাটো ঝামেলায় পক্ষ নিতে, নাক গলাতে, আজও তার কোনওরকম বদল ঘটেনি। আজ এসএফআই-এর কোনও চিহ্ন দেখা যায় না, ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনেরই একাধিক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ ও কলেজ দখলের লড়াইয়ে মত্ত। বলাই বাহুল্য, উদ্দেশ্য সেই আগের মতোই ‘মহৎ’— যতটা সম্ভব আয় বাড়ানো ও পকেট ভারী করা— ‘খারাপ’ দিনের কথা সবাইকেই মাথায় রাখতে হয় কিনা! ‘ছাত্র রাজনীতির শবযাত্রা সেই দিনই রাজনীতির বুড়ো ঘোড়াদের কাঁধে চেপে বেরিয়ে গিয়েছে।’— মন্তব্য করেছেন সেকালের এক আগুনখেকো বামপন্থী ছাত্র নেতা, যিনি তাঁর কেরিয়ার-সংসার ছাত্র আন্দোলনে বিসর্জন দিয়েছিলেন। যে দিন চল্লিশে পৌঁছেও তাঁরা ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব ছাড়তে পারেননি কিশোরদের তরতাজা আবেগকে বিক্রি করে খাওয়ার নেশায়, সেই দিনই বাস্তবের মাটিতে ঠোক্কর খায় প্রথম যৌবনের দামালপানা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ক্রমেই মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে এই ধান্দাবাজ ছাত্র-রাজনীতি থেকে।

ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ইতি ও প্রতিবাদের শবযাত্রা

আজ যখন দেখি গোটা রাজ্য একের পর এক বিরোধীশূন্য হয়ে যাচ্ছে, রীতিমতো ‘কিছুদিন ঘুরে আসি ভাই’ জাতীয় ‘অনুমতি’ নিয়ে তৃণমূলে নাম লেখাচ্ছেন আজন্ম ‘কংগ্রেস’ নামের বিরোধী বামপন্থী নেতা, তখন কিন্তু মনে হয়, দোষ এঁদের মোটেই দেওয়া যায় না, এটাই বোধহয় স্বাভাবিক, কালের নিয়ম। কারণগুলো একটু খুঁজলেই দেখা যায়— ছাত্র-রাজনীতিতে অ-ছাত্রদের প্রাদুর্ভাব যেমন মেধার বহির্গমনে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল, তেমনই ভাটা পড়তে থাকল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায়। জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক সখ্যে যখন কোনও ছুঁতমার্গ রইল না, তখন কলেজে কলেজে ছাত্রস্বার্থে গড়ে ওঠা আন্দোলন স্বভাবতই ব্যাহত হল অনেকাংশেই, বলাই বাহুল্য। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া নিয়ে

বাম-সরকারের বিরুদ্ধে বা জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে কং-সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের যে তীব্রতা ছিল বা যে 'প্যাশন' ছিল, পরবর্তীকালে সোনিয়া-কারাট সখ্য সেই তীব্রতাকে কমিয়ে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে, কারণ ততদিনে ছাত্র-রাজনীতি রাজ্য-রাজধানীর রাজনীতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝাঁজ ছাত্রদের মধ্যে তখন অনেকটাই কমে এল, যখন দেখা গেল বেশির ভাগ কলেজ ইউনিয়ন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দখলে। রাজ্যে পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেল ক্ষমতার বদল ঘটেছে, কিন্তু সেই চিত্রে বদল ঘটবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

একই সঙ্গে অন্য দিকে দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করা পলিটব্যুরোর 'পালিত বুড়ো'রা আরও একটি ভুল জেনে বা না জেনে করে গিয়েছেন তা হল, পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বকে সযত্নে লালন করার পরিবর্তে তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়া। ফলস্বরূপ, কালের নিয়মে ক্ষমতা যখন তাদের হাত থেকে চলে গেল, তখন দেখা গেল ব্যাটন ধরার মতো পরবর্তী প্রজন্মের কেউ নেই। কারণ ততদিনে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার অকালমৃত্যু ঘটেছে তাঁদেরই সৌজন্যে, পরবর্তী প্রজন্ম মহা উদ্দীপনায় যোগ দিয়েছে পরিবর্তিত শাসকদলে। আজ যেটুকু বিরোধিতা আছে তা শাসকদলের অভ্যন্তরেই। তাতে শাসকেরই সুবিধে, হাজার হলেও প্রতিবাদের তো অপমৃত্যু ঘটে গিয়েছে!

সমাজবিজ্ঞানীরা যা ব্যাখ্যা দেন তা হল— মেধার সঙ্গে চেতনা যোগ হলে তার যা শক্তি দাঁড়ায়, তাতে অসুবিধেয় পড়ে যেতে পারেন প্রচলিত রাজনীতির কারবারিরা। সেই আশঙ্কাতেই সুচারুভাবে মেধাকে পৃথক করার কৌশল নেওয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। অথচ ছাত্র-রাজনীতিকে স্বাধীন ঘরানায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে 'ছাত্র পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। দূরদৃষ্টিতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মেধাবী মনগুলিকে সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে তাদের চাপেই সুযোগসন্ধানী অযোগ্য অসৎ নেতারা একদিন সরে যেতে বাধ্য হবে, ভবিষ্যতের পক্ষে যা মঙ্গলজনক হবে। সে সময় ছাত্র-রাজনীতিতে প্রতিভাবান নেতাদের উত্থান বাম-ডান দু'পক্ষেরই নেতাদের মৌরসিপাট্টায় যথেষ্ট ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

এর পরেই দেখা গেল, ছাত্র-রাজনীতিতে দুর্বৃত্তের প্রাদুর্ভাব ঘটল, যার ফলে স্বভাবতই মেধাবী শঙ্কিত ছাত্ররা রাজনীতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে শুরু করল, আর পড়ে থাকা মধ্যমানের ছাত্রছাত্রীদের মূল সংগঠনের নেতাদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করা ছাড়া অন্য উপায় রইল না। আজও ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব সেই একই প্রথা চালিয়ে যাচ্ছেন সুকৌশলে।

স্কুলের সীমা অতিক্রম করতে না করতেই উত্তরবঙ্গ ছেড়ে বাইরে, নিদেনপক্ষে কলকাতায় চলে যাওয়া এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে— ভাল রেজাল্ট হলে তো কথাই নেই। অথচ উত্তরে এখন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জেনারেল কলেজের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে, যোগাযোগব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় বাইরে থেকে শিক্ষকরাও আসছেন। অন্য দিকে বাইরে থেকে আসা শিক্ষকরাও বলছেন, এখানকার ছেলেরা যথেষ্ট মেধাবী, মেধার কোনও অভাব দক্ষিণবঙ্গ বা অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে নেই। অথচ তা সত্ত্বেও মেধার বহির্গমন বন্ধ হয়নি, বরং বেড়েই চলেছে। এর উত্তরে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বলছে একটি কথাই— পড়াশোনার পরিবেশ এখানকার কলেজগুলোতে যথেষ্ট বিঘ্নিত। রাজনীতির নামে ক্রমাগত গোষ্ঠী সংঘর্ষ ও অশান্তি, চাঁদার নামে ও ভরতির নামে মোটা চাঁদার জুলুম ইত্যাদি অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছে। স্বভাবতই অভিভাবকরা মনে করছেন, বাইরে অন্য কোথাও চলে যাওয়াটাই বোধহয় এর থেকে পরিত্রাণের উপায়, তাই ছেলেমেয়েরা আবদার করলে 'না' বলবার ভরসা মিলবে কোত্থেকে?

অভিভাবকদের এই আশঙ্কা কিন্তু শিক্ষকরাও স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে, অশান্তি, ক্লাস বয়কট চলতেই থাকলে কাহাঁতক আর ক্লাস নেবার উৎসাহ থাকে বলুন? আর ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থাকা শিক্ষকদের কথাই আলাদা— তাঁদের হাবভাব সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের 'আসি যাই মাইনে পাই'য়ের মতোই হয়ে গিয়েছে। ক'দিন আগেই কানে এসেছিল, সম্প্রতি প্রশাসনিক কড়া মনোভাবের জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক দাদাদের 'বকুনি' খেতে হয়েছে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকেও, যিনি পাণ্ডিত্যের নিরিখে অন্য অনেক বড় 'অফার' ছেড়ে শিক্ষা মন্ত্রীর অনুরোধে এসেছিলেন স্রেফ মাটির টানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাইছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব— এটা মোটেও মন থেকে মেনে নিতে পারেননি উপাচার্য। ভারাক্রান্ত মনে তিনি দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছেন— এটাই বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। সেই দিন অনেকেরই মনে হয়েছিল, ডুয়ার্সের শিক্ষিত মানুষের কাছে এ বড় দুঃখের সময়। যেখানে মেধা নেই, মেধার সন্ধান বা মর্যাদা নেই, দারিদ্র-অপরাধ- উগ্রবাদের অন্ধকার ছাড়া আছে কেবল ঝান্ডা হাতে মিছিল— বাকি, শিক্ষা গিয়েছে বনবাসে।

উত্তরায়ণ সমাজদার

এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব

অগাস্ট ১, ২০১৬ থেকে চালু হয়ে গেল 'এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব'। ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ, বন্যপ্রাণ ও নানাবিধ ঘটনাকে ফ্রেমে বন্দি করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস। ছবি তোলা যাদের নেশা তারা যে কেউ এই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন।

- এক বছরের সদস্য চাঁদা ৫০০ টাকা।
- সদস্যদের সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হবে।
- সদস্যরা তাঁদের বাছাই করা ছবি নিয়মিত পাঠাতে পারবেন অন লাইন-এ।
- মাসে একবার আড্ডাঘরে সদস্যদের বৈঠক বসতে পারে। সেখানে বাছাই করা ছবি দেখা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে।
- ত্রৈমাসিক ওয়ার্কশপ-ফটোওয়াক হবে অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের তত্ত্বাবধানে।
- বাছাই ছবি নিয়ে কলকাতায় ও জলপাইগুড়িতে বছরে দু'বার চিত্র প্রদর্শনী হবে।
- নির্বাচিত ছবি 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ছবি প্রতি সম্মান দক্ষিণা পাবেন চিত্রগ্রাহক। বছরে দু'বার এই দক্ষিণা সাকুল্যে দেওয়া হবে।
- পাঠানো ছবি ফেসবুক বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।
- সদস্য হতে গেলে চেক পাঠাতে হবে Ekhon Duars নামে।
- আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগঃ অমিতেশ চন্দ। আড্ডাঘর। মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭।

অনুশাসন নেই, শিক্ষক নেই 'শিক্ষার প্রগতি' রাজনীতির পাঁকে থমকে

গোড়াতেই মূল্যবান কথা বলেছিলেন শিলিগুড়ির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দত্ত। মূল্যবোধ এবং অনুশাসন বিষয়ক একান্ত আলাপচারিতা পর্বে তিনি একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটা এইরকম— সন্ধ্যায় বাবা বাড়ি ফিরে ছোট্ট ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তোর জন্য একটা কলম এনেছি।' ছোট্ট ছেলে। নতুন কলম পেয়ে দারুণ খুশি। কলমটায় কী সুন্দর লেখা যায়। এত সুন্দর লিখছে কলমটা, নিশ্চয়ই বেশ দামি। বসার ঘরে বাবা বসে টিভি দেখছেন। গুটিগুটি পায়ে ছেলে এসে দাঁড়াল। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, কলমটার কত দাম?' বাবা বললেন, 'দাম জেনে কী হবে? ওটা আমি কিনে আনিনি। অফিস থেকে আমাকে দিয়েছে লেখালেখির জন্য। আমি তোমাকে দেব বলে নিয়ে এসেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে তো?' মাথা নেড়ে চলে গেল ছেলে। পরদিন ভোরবেলা ছেলে স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে এল বাবার কাছে। বলল, 'বাবা, ওই কলমটা তোমার টেবিলে রেখেছি, তুমি নিয়ে নিয়ো।'

—কেন, তুমি নেবে না?

—ওটা তো তোমার অফিসের কলম। অফিস লিখতে দিয়েছে। পরে আমার জন্য একটা কিনে এনো। এখন আমার কলম চাই না।

ছেলে চলে গেল স্কুলে, কলমটা রেখে দিয়ে। এই রেখে যাওয়া অনেক কথা জানান দিল।

গল্পটা শেষ করে বিশ্বনাথদা আমায় বলেছিলেন, 'গল্পটাকে আমি বলি অনুশাসনের গল্প। পারিবারিক অনুশাসন। এই অনুশাসন কেবল বড়রাই জারি রাখবে তা নয়, ছোটরাও তো বলবৎ করতে পারে। অফিসে লিখতে দেওয়া কলম বাড়িতে নিয়ে আসা থেকে দুর্নীতির পথে যে যাত্রা শুরু, সেই যাত্রায় প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ এল পরিবারে, একটি ছোট ছেলের কাছ থেকে। এইরকম পারিবারিক অনুশাসন তথা প্রতিবাদ উঠতে থাকলে ধীরে ধীরে তা এক বৈপ্লবিক ফল এনে দিতে পারে জাতির সামনে।'

যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, মাকে বলতে শুনতাম, যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি। মা ছিলেন মাধ্যমিক পাশ, জামশেদপুরের সাকচি সারদামণি গার্লস' হাই স্কুলের ছাত্রী। আজ মা প্রয়াত। কিন্তু আজও মায়ের মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লেখা ডায়েরি আমার হেপাজতে। বাবা প্রশাসনিক বড় মাপের অফিসার ছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ করেই বাবাকে পেতাম পড়ার টেবিলে— ছ'মাসে-ন'মাসে একবার। বাবা মাঝে মাঝে চাণক্য শ্লোক শুনিয়ে বলতেন, 'মনে রেখো, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' মা-র কাছ থেকে পুরাণের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প আর বাবার কাছ থেকে একলব্যর গল্প, সত্যকামের গল্প শুনে ছোটবেলা থেকেই অদ্ভুত এক আদর্শবোধ জন্মেছিল, যার থেকে এই আধবুড়ো বয়সেও বেরতে পারিনি। কিন্তু বয়স যত বাড়ছে, ততই চারপাশে যা দেখছি, এমনকি নিজের পরিবারে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক যে প্রতিফলন দেখছি, ততই বুঝতে পারছি, আমি ভুল শিক্ষা পেয়েছিলাম। ভালভাবে পড়াশোনা করলেই গাড়িঘোড়া চড়া যায় না। ক-অক্ষর যে জানে না, সে-ও দামি গাড়ি চড়ে। তার জন্য কিছু বাস্তব জ্ঞান থাকা চালাকচতুর হওয়া প্রয়োজন। তাই শিক্ষক নেতা বিপ্লব ঝাঁ-ও আমার হতাশাকে সমর্থন করে বলেন, 'সত্যিই, বিদ্বান সর্বত্র পূজা পায় না। সংবাদপত্র খুললেই প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাচার্যর নিগ্রহের যেসব খবর পাই, তাতে সমাজ যে কোন দিকে যাচ্ছে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। আজ প্রতিটি পরিবারেই অনুশাসন পর্বের বিদায়ঘণ্টা বেজে চলেছে। এই অনুশাসন ফেরাতে হবে, জারি রাখতে হবে। পরিবারের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে। পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনই যে রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে শ্বাস নেওয়ার সুযোগও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে পারিবারিক ব্যবস্থাতেও রাজনীতি বাসা করে নিচ্ছে।' শিক্ষক নেতা বিশ্বনাথ দত্তরও একই মত, 'ঠিকঠাকমতো একজনকে যদি ধরতে পারা যায়, জীবনের অগ্রগতি কেউ ঠেকাতে পারবে না— এটাই আজকাল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। এর-ওর দুয়ারে ঘুরে, চেলা-চামচের অনুগ্রহ নিয়ে যে কিছুই হয় না— এটা বোঝাবে কে? সবাই মোহজালে আবিষ্ট। পৌঁছাতে হবে 'সুপ্রিমো'র কাছে। তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে জীবনে সাফল্য বা ব্যর্থতা।'

বানারহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্যর মতে, 'আজকের অভিভাবক, ছেলেমেয়েরা সব ক্ষেত্রে কেবল

উত্তরবঙ্গের মোট ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২২টি তপশিলি জাতি এবং ১৮টি তপশিলি উপজাতিভুক্ত। অথচ মানব উন্নয়নের সূচকে এই অঞ্চলগুলি কালো তালিকাভুক্ত। শিক্ষা তো দূর অস্ত, বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাগুলিও এখানে অচল। উচ্চবর্গীয় বঞ্চনায় আদিবাসীরা এতটাই পশ্চাৎপদতায় ভুগছে যে এদের প্রথম সারিতে তুলে আনা খুবই কঠিন কাজ।

প্রথম হচ্ছে— এটাই দেখতে চান। ওরা সৎ হচ্ছে, সত্যবাদী হচ্ছে, সৎ কর্মে উৎসাহী হচ্ছে এমনটা কল্পনা করার সময় পায় না। আজ যখন কলেজে অধ্যক্ষ নিগ্রহ হচ্ছে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষককে মারধর করছে, তখন খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যারা এ হেন কুকর্মের কান্ডারি, তাদের বাড়িতে এসবের কোনও প্রতিবাদ নেই। অধিক ক্ষেত্রে বরং সমর্থনই আছে। এমন পরিবার অসংখ্য, যেসব পরিবারের ছেলেরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে পরীক্ষা হলের পাখা বা দরজা-জানালা কীভাবে ভেঙে দিয়েছে, তার গল্প করছে বাড়িতে এসে, আর শুনে অভিভাবকরা হাসছেন, মজা করছেন। তাঁরা আজকাল সবকিছুই দেখছেন রাজনীতির চোখে, লাভ-লোকসানের হিসেব কষে।'

শিক্ষক নেতা প্রসেনজিৎ সরকারও তা-ই মনে করেন— 'প্রকৃত শিক্ষা একটাই এখনকার বঙ্গীয় সমাজে যে, শুধু লাইনে থাকলেই চলবে না। অগ্রাধিকার আদায় করে নিতে হবে। সঠিক দেবতাকে সঠিক ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে। যদি কেউ মহাজ্ঞানী হন, উজ্জ্বলতর শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হন, মননশীলতা থাকে, তবুও কোনও সম্ভ্রান্ত উচ্চপদে বা কমিটিতে তাঁকে ডাকা হবে না বা তাঁর স্থান হবে না। তোমার গুণ তথাকথিত বিদ্যাচর্চার নয়, কাজে ও কথায় চৌকশ হতে হবে, আত্মপ্রচারের ঢাক বাজাতে হবে, মন্ত্রী বা নেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে কিংবা কোনও যোগসূত্র খুঁজে নিতে হবে। তখনই তুমি হবে বরেণ্য ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, কবি বা সাহিত্যিক বা উপাচার্য, আকাদেমির মাননীয় সদস্য, নামীদামি পুরস্কারপ্রাপক।'

আসলে শিক্ষা ও সমাজসচেতনতা নিয়ে ফিল্ডওয়ার্ক করতে নেমে এই উপলব্ধিটা হল যে, সমাজের এই পঙ্কিলতাকে কেউ সহ্য করতে পারছে না, আবার কিছু করতেও পারছে না। তাই আপস করতে হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে।

সুকল্যাণ বা বিপ্লবদের সঙ্গে আলাপচারিতার প্রাসঙ্গিকতায় মনে হয়, ছাত্র নামক শিক্ষক বা অধ্যক্ষ নিগ্রহকারীদের পরিবারে যেমন, তাদের শিক্ষককুলের পরিবারেও সম্ভবত পারিবারিক অনুশাসন পর্বের বিদায় ঘটেছে। যে ছাত্র লাঠি হাতে শিক্ষাঙ্গনে দাপিয়ে বেড়ায়. তার বাবা-মা বা ভাইবোন যদি একবার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আঙুল তুলত, তবে সে ছাত্র লাঠি ছেড়ে বই-কলম ধরতে বাধ্য হত। যে ব্যক্তি দলবাজি করে অধ্যক্ষ হচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী বা সন্তানরা যদি এই মানসিকতা এবং কর্মপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এতটুকুও সোচ্চার হত তাহলে তাঁর কর্মস্থল হয়ত মধুময় হত। যে সমস্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিডডে মিলের চাল-ডাল চুরির অভিযোগ উঠতে দেখি, তাঁদের পরিবারের কেউ কি সেই অভিযোগের কারণে তাঁকে পারিবারিক পর্যায়ে হলেও শাস্তিবিধান করে তাঁকে সংশোধনের পথ ধরতে বাধ্য করে? তাই এসব অপরাধ ক্রমবর্ধমান। যে মন্ত্রী চুরির দায়ে জেল খেটেছেন, তাঁর পরিবারে প্রতিবাদ বা অনুশাসন থাকলে তিনি ফের মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে শামিল হতে পারতেন না। সংশোধনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ আসবে কীভাবে?

ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে এসেছিলাম শিলিগুড়ি শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে শিলিগুড়ি চটহাট সড়কের ধারে রাঙাপানি গ্রামে। কাঁসিরামপাড়া, মধুপাড়া, পালপাড়া, বস্তিপাড়া এবং কেনাপাড়া— এই পাঁচটি ছোট ছোট পাড়া নিয়ে এই জনপদ। গ্রামে ৯০ শতাংশ তপশিলিভুক্ত পরিবার। প্রত্যেকেই দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। গ্রামের প্রায় ১০০০ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সাড়ে পাঁচ হাজার গ্রামবাসী ওরাওঁ বা সাঁওতাল জনজাতিভুক্ত। গ্রামের অদূরে রয়েছে একটি বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র এবং একটি উচ্চবিদ্যালয়। কোনও হিন্দি বা সাঁওতালি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় মূলত ভাষাগত সমস্যার জন্যই এই অঞ্চলে আদিবাসী জনজাতির শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়বিমুখতা সর্বাধিক। যে দু'-চারজন বিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, তাদের মোটা টাকা খরচ করে শিলিগুড়ি শহরে যেতে হয়। ফলে অর্থের টানাপোড়েনে তাদের মাঝপথে উচ্চশিক্ষায় ইতি টানতে হয়।

একই চিত্র উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জনপদেরই, যেখানে আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও এদের করুণ অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। উত্তরবঙ্গের মোট ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২২টি তপশিলি জাতি এবং ১৮টি তপশিলি উপজাতিভুক্ত। অথচ মানব উন্নয়নের সূচকে এই অঞ্চলগুলি কালো তালিকাভুক্ত। শিক্ষা তো দূর অস্ত, বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাগুলিও এখানে অচল। উচ্চবর্গীয় বঞ্চনায় আদিবাসীরা এতটাই পশ্চাৎপদতায় ভুগছে যে এদের প্রথম সারিতে তুলে আনা খুবই কঠিন কাজ। রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হতে হতে এদের অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে, বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা এখানে ব্যাপ্ত হয়েছে। অর্থের অভাবে আদিবাসী যুবক-যুবতীরা অসাধু ব্যবসায়ী, চোরাকারবারিদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছে। স্মাগলিং, ব্ল্যাক মার্কেটিং, ওয়াগন ভাড়া, নারী পাচার, ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। অথচ ইউনেস্কো'র নির্দেশ অনুযায়ী যে সমস্ত এলাকায় প্রান্তিক আদিম জনগোষ্ঠীর বাস, সেখানকার আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সেই অঞ্চলের সরকার তথা প্রশাসনের দায়িত্ব সর্বাধিক। বাস্তবে উপরতলার গণ্যমান্য ভদ্রলোকরা এসবের দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে এদের মূলস্রোতের বিরোধী বা সমাজবিরোধী আখ্যা দিতেই অধিকতর ব্যস্ত থেকেছেন।

স্টেট ব্যাঙ্কে কর্মরত রতন চক্রবর্তীর মতে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি আমাদের চেতনাবোধের। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য কেবলমাত্র সরকারকেই দায়ী করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের দোষও প্রচুর। নিজেদের দোষকে না ঢেকে চেষ্টা করি না কেন শিক্ষাকে নিজের মতো করে চলতে দেওয়ার? শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, তার কারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এই অভাব দূরীকরণে শিক্ষকদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করছে, তাতে শিক্ষা মার খাচ্ছে। শিক্ষাই দেশের শক্তি। সেই শক্তি আজ হার মেনেছে পেশিশক্তির কাছে। যদিও এই শক্তি এক বছরে বা পাঁচ বছরে বাড়েনি, এর প্রসারতা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। সুতরাং এই নিয়ে কেবল রাজনৈতিক ভাষণ

সুফল দেবে না। শিক্ষাক্ষেত্রকে নিয়ে রাজনীতি সর্বস্তরে এখনই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার মান, শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন, এখনও ডুয়ার্সের চা-বলয়ে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নত নয়। বছরের পর বছর বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা ও সংকটের মধ্যে দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষার সূতিকাগার হিসেবে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়, সেই বিদ্যালয়গুলিতেই সমস্যা বেশি। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে কোনও ঘরই নেই, কোনওরকমে গাছতলায় বা ক্লাবঘরে বা নড়বড়ে ভাঙাচোরা স্কুলঘরে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই লেখাপড়া চালাতে হয়। বহু বিদ্যালয়ে নেই শৌচাগার, নেই পানীয় জল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও এ জন্য কমে যায়। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে পরিকাঠামোর অভাব থাকলেও শুধুমাত্র মিডডে মিলের জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যায়। শিক্ষার পরিকাঠামোগত সমস্যা যে আছে তা স্বীকার করে নিয়ে সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে বলে দাবি তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা বাবলু রায়ের। তবে তাঁর মতে, কতটা হবে, আদৌ করা যাবে কি না, টাকার জোগান কোথা থেকে আসবে—এসব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে তিনি স্বীকার করেন, ছাত্রছাত্রীর তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ডুয়ার্সে এখনও অনেক কম। বিশেষ করে হিন্দি মাধ্যম, নেপালি মাধ্যম বিদ্যালয় খোলা খুবই জরুরি। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম। ফলে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হয়। বঞ্চিত হয় ছাত্রছাত্রীরা। বাবলু মনে করেন, ৩৫:১ অনুপাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। প্রাথমিক বিভাগের পড়ুয়াদের বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ প্রসারিত হওয়া উচিত। কারণ ছোট শিশুরা অনেক সময়ে বিদ্যালয় দূরে থাকার জন্য রোজ বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। কারণ গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে বা চা-বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে যারা পড়াশোনা করে, তাদের মা-বাবারা পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে পারে না। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসব ছাত্রছাত্রী দুস্থ পরিবার থেকে আসে, যাদের মা-বাবা সকালে কাজে বার হয়ে বিকেলে বাড়ি ফেরে। তাই নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে এবং বলা হয়েছে, প্রতি তিন কিলোমিটারের মধ্যে যেন একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কারণ

এখনও ডুয়ার্সের চা-বলয়ে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নত নয়। বছরের পর বছর বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা ও সংকটের মধ্যে দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষার সূতিকাগার হিসেবে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়, সেই বিদ্যালয়গুলিতেই সমস্যা বেশি। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে কোনও ঘরই নেই।

শিশুর বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয় থাকলে তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ অনেক বাড়বে, মা-বাবারাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলির জন্য ৯৯৯ জন এসআই থাকার কথা। রয়েছেন ৬২১ জন। এসআইদের দপ্তরে এসআই-সহ ৬ জন কর্মী থাকার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা না থাকার ফলে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেনশন ফাইল আটকে যাচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছুটি অনুমোদন পাচ্ছে না, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা মঞ্জুর হতে সময় লাগছে বিস্তর। কখনও প্রকল্পের টাকা ফিরেও যাচ্ছে। বিদ্যালয় পরিদর্শনও প্রায় শিকেয় উঠেছে বলে অভিযোগ নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝাঁ-র।

সিএলআরসি সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়াশোনার মান বজায় থাকছে কি না তা দেখতে মাঝেমধ্যেই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয় তাদের। নজরদারি করতে হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাজিরার উপরেও। কর্মরতদের বেতনের বিল বানানোর পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেনশনের কাগজপত্রও তৈরি করতে হয়। শিক্ষকদের ছুটির আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে পাঠানোর দায়িত্ব এসআই-এর দপ্তরের। বিদ্যালয়গুলি পড়ুয়াদের নিয়ম মেনে মিডডে মিল খাওয়াচ্ছে কি না, তার মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করে এসআই'কে পাঠাতে হয় বিডিও এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে। এবিপিটিএ রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তীর অভিযোগ, বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ শূন্য থাকার ফলে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে।

ডুয়ার্সের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার বক্তব্য, দীর্ঘ দিন আগে সার্ভিস বুক পাঠানো হলেও অবসর নেওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেনশন সংক্রান্ত ফাইল আটকে থাকা, সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্পের টাকা তদারকির অভাবে ফিরে যায় মাঝেমধ্যে। সর্বশিক্ষা প্রকল্পে টাকা মঞ্জুর হতে সময় লাগছে। শিক্ষকদের ছুটির আবেদনপত্র তৈরিতেও সময় লাগছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বীরপাড়া চক্রের জনৈক এসআই-এর বক্তব্য, তাঁর অধীনে দু'টি চক্রে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮০টি। তাই নিয়ম করে বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শনে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সব কাগজপত্র নিজের

হাতেই সামলাতে হয়।

সর্বশিক্ষা মিশনের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়ার সরকারি পদক্ষেপ ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভূত উপকারে লাগছে। গ্রামবাংলা, বিশেষত চা-বলয়ের গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা এর ফলে দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে। কারণ, পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার জন্য অনেকে প্রয়োজনীয় পোশাক কিনতে পারে না। এই না-পাওয়ার অভাব দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বলে মনে করেন সর্বশিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি জেলার কোঅর্ডিনেটর রাজা দত্ত। নিজেরা পোশাক কেনার হাঙ্গামা দূর করতে মাথাপিছু ৪০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তবে অভিভাবক তথা অরবিন্দ মাধ্যমিক-এর ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি অনিল রায় মনে করেন, বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী পোশাকের জন্য ৪০০ টাকা পর্যাপ্ত নয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দু'সেট পোশাকের জন্য দেওয়া হচ্ছে মাথাপিছু ৪০০ টাকা করে। বীরপাড়া হাই স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য শিক্ষা সেলের নেতাও মনে করেন, সরকারি বরাদ্দ কমপক্ষে ৬০০ টাকা করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে পোশাকের সুবিধা দেওয়া উচিত। কারণ হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ প্রাথমিক স্তরে নিয়ে আসার পরিকল্পনা বহু দিনের। আর এটা হলে সকল শ্রেণির পড়ুয়াদের কল্যাণসাধন হবে, উৎসাহিত হবেন বিদ্যালয় শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত শিক্ষকরাও।

রাজ্যের সাম্প্রতিক শিক্ষাচিত্র তথা ডুয়ার্সের শিক্ষাব্যবস্থাসহ জলপাইগুড়ির শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাচিত্র জানাতে গিয়ে সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি জানালেন এই প্রতিবেদককে। তাঁর মতে, রাজ্যের শিক্ষাসংস্কারের সার্বিক অভিমুখ দু'টি। এক, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও গতিশীল করা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি সরকারের প্রথম দফায় ইতিবাচক কাজ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও শিক্ষাসংস্কারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি মনিটরিং করছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য মাস পয়লা মাইনে, প্রভিশনাল পেনশন, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রীর মতো সুবিধা ঘোষণা করে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছেন। সংগত কারণেই বিভিন্ন মহলে শিক্ষাসংস্কারের এই উদ্যোগ নিয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে। পলিটেকনিক, আইআইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিএড, ডিএড কলেজ স্থাপনে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষাকে গতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

'মিথ্যা কথা।' সাংসদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতেই গর্জে উঠলেন শিলিগুড়ির বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক তথা এবিটিএ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা তমাল চন্দ— 'আসলে সবটাই রাজনীতি হচ্ছে। শিক্ষাকে দলতন্ত্রমুক্ত করার জন্য সরকারি দল তৃণমূল তার পৃষ্ঠপোষকদের নানা পদে ও কমিটিতে বসিয়ে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে নয়া দলতন্ত্র কায়েম করা। কারণ কে না জানে, আজ জন্মস্থান থেকে শ্মশানঘাট রাজনীতি সংক্রামিত।'

তৃণমূল শিক্ষা সেলের সুব্রত রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণই ভিন্নধর্মী। 'মানুষ কবেই বা নিরপেক্ষ ছিল? আদিমকাল থেকেই ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীকে একটি পক্ষ অবলম্বন করতেই হয়েছে। কখনও আত্মরক্ষার তাগিদে, কখনও আবার স্বভাবের তাড়ায়। তবে হ্যাঁ, বামেদের ৩৪ বছরের শাসনকালের শেষে আমরা একটা জিনিস শিখেছি যে, যদি তুমি আমার লোক হও, তবে তুমি নিরপেক্ষ, সর্ববিদ্যাবিশারদ। আর যদি তুমি মমতার লোক হও, তবে তুমি কেবল শত্রুপক্ষই নও, তুমি পলিউটেড পলিটিশিয়ান।' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সুব্রতবাবুর অভিব্যক্তি, 'সে জন্যই সাইনবোর্ডসর্বস্ব দলটির নেতাদের জনভিত্তিটাই নেই।'

রবি হাঁসদার বয়স ১৩, রিকশা চালায় বীরপাড়া বাস স্ট্যান্ডে।

—পড়া ছেড়েছিস কবে?

—অনেকদিন, সেই ক্লাস ফাইভ।

—কেন?

—বাড়িতে খাবার জোটে না। বাবা চা-বাগানে কাম করে। রোজগার কম। বাড়িতে পাঁচ ভাইবোন। হাঁড়িয়া খেয়ে আসে রোজ, চাল আসে না, মাকে পেটায়। তাই কামে নেমে গেসি।

সহজ-সরল স্বীকারোক্তিতে সে জানায়, সকালে স্ট্যান্ড দাঁড়ালে সওয়ারি হয় জনা দশেক। ১০ টাকা করে ১০০ টাকা ঘরে নিয়ে যেতে পারে। আমি মনে মনে ভাবি, বিদ্যালয়ের বাইরে এই ছেলেরা কী সুন্দর মুখে মুখে অঙ্ক কষে, বিদ্যালয়ে থাকলে আরও কত কী শিখত! না, শিখত না, সেই সম্ভাবনাই বেশি। কারণ প্রাথমিক স্তরে গ্রামীণ

'মানুষ কবেই বা নিরপেক্ষ ছিল? আদিমকাল থেকেই ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীকে একটি পক্ষ অবলম্বন করতেই হয়েছে। কখনও আত্মরক্ষার তাগিদে, কখনও আবার স্বভাবের তাড়ায়। তবে হ্যাঁ, বামেদের ৩৪ বছরের শাসনকালের শেষে আমরা একটা জিনিস শিখেছি যে, যদি তুমি আমার লোক হও, তবে তুমি নিরপেক্ষ, সর্ববিদ্যাবিশারদ। আর যদি তুমি মমতার লোক হও, তবে তুমি কেবল শত্রুপক্ষই নও, তুমি পলিউটেড পলিটিশিয়ান।'

এলাকা, চা-বাগিচা বা জলপাইগুড়ির কৃষি বলয়ে যে ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায়, তাদের দশজনের চারজন চতুর্থ শ্রেণি পেরিয়েও সরল বিয়োগ করতে পারে না, মাতৃভাষায় লেখা সরল বাক্য পড়তে পারে না। এমনকি অষ্টম শ্রেণি পাশ করে গিয়েও ১৫ শতাংশ আদিবাসী বা তপশিলি ছেলেমেয়ে এগুলো পারে না। ময়নাগুড়ি বাজারে বাবার দোকানে হাটবারে চানাচুর-বিস্কুট বিক্রি করছিল বাবাই। বাবাই রায়। চানাচুরের প্যাকেট কত করে প্রশ্ন করতেই একটা তুলে পিছনের ঝাপসা বেগুনি কালির ছাপা লেখা বলে বলে দিল, 'আড়াইশো ৩০ টাকা।' 'এক কিলোগ্রাম কত?' 'কেন, ১২০ টাকা?' পাশের একজন ২৮ টাকার জিনিস কিনে ৫০ টাকা দিলে বাবাই ফেরত দিল ১৬ টাকা। —'গতবারের ছ'টাকা বাকি ছিল না?' এই হচ্ছে শিক্ষাচিত্র। লজ্জায়, বিরক্তিতে যারা বিদ্যালয় ছেড়ে দিচ্ছে, তাদের অনেকেই কিন্তু কাজ করতে গিয়ে হিসেব করছে দিব্যি, কাজ চালানোর মতো পড়তে-লিখতেও জানে। যার কথাবার্তায় জড়তা নেই, মুখে মুখে অঙ্ক করায় ভয় নেই, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে নিজের কাজ হাসিল করার মতো জটিল কাজও যে করতে পারে, তার খাতায় বছর বছর পড়ত কেন লাল কালির দাগ? শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে বিদগ্ধ সমাজের কাছেই প্রশ্নটা তুলে দিলাম। সমাজ পরিচালকরাই এর উত্তর খুঁজুন।

গৌতম চক্রবর্তী

উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার

দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা সরকারের প্রতি বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, বলাই বাহুল্য। উত্তরের সাতটি জেলার মানুষের মনে ভরসা জেগেছে গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের খতিয়ান দেখে। হতাশাও জমে রয়েছে বহু এলাকায়। পাওয়া, না-পাওয়ার যুগে মানুষ দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় নিজের ও এলাকার উন্নয়নকে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে উত্তরের মানুষের বাছাই করা কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল নবগঠিত রাজ্য সরকারের নতুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর সামনে।

পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তর

প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকেই উন্নয়নের খাতে ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব আপনার দপ্তরে চলে এসেছে। এখন কেবল অনুমোদনের অপেক্ষা বলেই শুনেছি। মালদা থেকে কত টাকার কী প্রস্তাব এসেছে আপনার কাছে? মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে আপনি নিশ্চয়ই থাকবেন, কিন্তু তার আগে একবার আপনার সফর আশা করেছিল মালদা জেলার মানুষ।

—**সতীশ মৈত্র**, ইংরেজবাজার, মালদা

উত্তর: ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব সব জেলা থেকে চলে আসেনি, আসা শুরু হয়েছে। প্রস্তাব এলে আমরা নিশ্চয়ই তা খতিয়ে দেখব। আর সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক তা অবশ্যই অনুমোদন করা হবে। মালদা জেলার ক্ষেত্রে যে কাজগুলো চলছিল তা এখনও শেষ হয়নি। ফুলহার নদীর উপর যে ব্রিজটি তৈরি হচ্ছে, তার মাত্র ৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। ওখানে একটা পলিটেকনিক কলেজ হচ্ছে, তার ৪০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। আর একটা ডিগ্রি কলেজও হচ্ছে মালদায়, তার কাজ প্রায় শেষের দিকে। একটা কিষান বাজার হয়েছে। এ ছাড়াও ওই জেলায় প্রচুর রাস্তাঘাট করা হয়েছে। কাজ তো হচ্ছেই। মালদা থেকে এখনও বেশি প্রস্তাব আসেনি, ইরিগেশনের উপর একটা প্রস্তাব এসেছিল। ২৫ কোটি টাকার এই প্রস্তাব। আমরা তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি অনুমোদনের জন্য। পাগলি নদীর জল স্লুইস গেট দিয়ে ঢুকিয়ে তা আটকে রেখে চাষের কাজে ব্যবহার করা হবে। মালদায় ৩ লক্ষ টন আম উৎপাদন হয় প্রত্যেক বছর। এই আমকে কেন্দ্র করে একটা ফুড প্রসেসিং হাব করার কথা ভাবা হচ্ছে। এ ছাড়াও ভুট্টা প্রচুর উৎপাদন হয় এখানে, ভুট্টার একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, আমরা তাকে আরও বাড়াতে চাইছি। মালদার গৌড়ের একটা ঐতিহ্য রয়েছে, এগুলোকে আমরা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি। মালদা থেকে আরও কিছু রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ ইত্যাদির প্রস্তাব এসেছে, আরও আসবে। আগামী ৪ তারিখ সব ডিএম'কে ডাকা হয়েছে, তাঁরা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে এগুলোতে সবুজ সংকেত দেবেন।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমার মন্ত্রিত্বের দু'মাস হল সবে। ১৫ দিন গেল বিধানসভা অধিবেশনে। আমি তো মালদা তিনবার গেলাম এই অল্প সময়ের মধ্যে। উনি হয়ত ঠিক খোঁজ রাখেননি। তার মধ্যে দু'বার আমি প্রশাসনিক বৈঠক করেছি, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিটিং করেছি। মালদার বিভিন্ন গুণীজন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে, কবি- সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিটিং করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা হয়েছে।

প্রশ্ন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনে সেরা স্থান পেয়েছে। অথচ দেশীয় মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য ইংল্যান্ড ফিশারিজের একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ কেন নেওয়া হচ্ছে না?

—**সীমা সরকার**, চক ভবানী, বালুরঘাট

উত্তর: এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি। তবে আমরা চাই শুধু দক্ষিণ দিনাজপুর নয়, অন্য জেলাগুলিও মাছ চাষে ভাল করুক। এর আগে মাছ চাষে মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করার জন্য নানান জেলায় মাছ উৎসব করা হয়েছে। মানুষের মানসিকতা তৈরি করার জন্য, তাদের মাছ চাষে উৎসাহিত করার জন্য এ ধরনের ওয়ার্কশপ ভীষণ জরুরি। এ ক্ষেত্রে আমাদের যাঁরা মৎস্য বিশেষজ্ঞ রয়েছে, আমরা তাঁদের উপরই নির্ভর করছি। এতে ভাল ফলও পাওয়া যাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া নদীয়ালি মাছগুলোকে আমরা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি নতুন করে। দেশীয় মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গবেষণাগারের কথা ভাবা হচ্ছে, একটু সময় লাগবে তার জন্য। তবে ওই জেলার মাঝিয়ানে যে কৃষিবিজ্ঞান গবেষণাগার রয়েছে, সেখানে কিন্তু কৃষি গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে মাছ নিয়েও গবেষণা করা হয়।

প্রশ্ন: রঘুনাথপুর থেকে জেলা শহরে ঢোকার জন্য আত্রেয়ী নদীর উপর দিয়ে বিকল্প রাস্তার দাবি আমাদের বহু দিনের। আগের উন্নয়ন মন্ত্রী এ ব্যাপারে কিছু করেননি। আপনি কি কোনও উদ্যোগ নিতে পারেন?

—**পার্থ মণ্ডল**, মাহিনগর

উত্তর: দক্ষিণ দিনাজপুরে সুই নদী, কচুয়া নদী, পুনর্ভবা নদী ইত্যাদি ৫টা ব্রিজের কাজ চলছে আমাদের। আমি এখনও রঘুনাথপুর যেতে পারিনি, তাই ব্যাপারটা আমার ভাল জানা নেই। তবে কানে যখন এল, তখন অবশ্যই দেখব।

প্রশ্ন: নাটক তথা সংস্কৃতির পীঠস্থান বালুরঘাট। অথচ এখানকার একমাত্র সরকারি অডিটোরিয়াম রবীন্দ্রভবন বহুদিন থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কারও কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। এই সংস্কারের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার জন্য আপনি কি কিছু করতে পারেন?

—**নিমাইচন্দ্র মণ্ডল**, বেলতলা পার্ক, বালুরঘাট

উত্তর: গোটা উত্তরবঙ্গের রবীন্দ্রভবনগুলোর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যেসব অডিটোরিয়াম ভগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল, সব ক'টা জেলাতেই কমবেশি এখন তার কাজ চলছে। যেমন রায়গঞ্জ, কোচবিহার— এসব

জেলার রবীন্দ্রভবন ইতিমধ্যেই সংস্কার করা হয়েছে। বাকিগুলোও খুব দ্রুত সংস্কার করে ফেলা হবে।

প্রশ্ন: জলপাইগুড়ি শহর চিরকালই আড়ালে অবহেলিত থেকে গেল। অথচ এই শহরকে গেটওয়ে করে উন্নয়নের ভাবনা আজ অবধি কেউ ভাবল না। অন্যান্য জেলা শহর থেকে থাকলেও জলপাইগুড়ি থেকে সরাসরি রোজকার কলকাতা যাবার আলাদা কোনও ট্রেন নেই। জেলার হালও একই। আলাদা আরও মহকুমা এবং ময়নাগুড়িকে পৌরসভা করার কোনও উদ্যোগ নেবার মতো কেউ নেই। এমনকি আপনাদের দলের জেলা সভাপতি হবার জন্য জেলা থেকে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জলপাইগুড়ির মানুষকে এইসব দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটা কী করতে পারেন?

—**সুভাষ রায়,** বেগুনটারি, **নরেন্দ্র বর্মন,** হলদিবাড়ি, **জিতেন্দ্রনাথ বর্মন,** জলপাইগুড়ি

উত্তর: অবহেলার কথা ঠিক নয়। মানুষ উন্নয়ন চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের সব জেলাতেই উন্নয়নের কাজ চলছে। গত পাঁচ বছরে এই জেলার রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রক থেকে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা খরচ করে জলপাইগুড়িতে একটা স্পোর্টস ভিলেজ তৈরি করা হয়েছে। করলা নদীর অর্ধেকটা ইতিমধ্যেই সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। শহরের জলনিকাশির জন্য গদাধর খাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ির প্রাণকেন্দ্র দিনবাজার, যা এক সময় পুড়ে গিয়েছিল, ১১৬ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই জায়গায় একটা ছ'তলা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার জন্য প্ল্যান, ড্রয়িং, এস্টিমেটের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পুরসভা ডিএম-এর কাছে খুব শীঘ্রই জমিটা হস্তান্তর করবে। আমরা আশা করছি, আড়াই-তিন মাসের মধ্যে কাজ শুরু করতে পারব। জলপাইগুড়িতে একটা আর্ট গ্যালারি করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে উত্তরকন্যা করেছেন তা কিন্তু এই জলপাইগুড়ি জেলাতেই। সুতরাং জলপাইগুড়ি অবহেলিত বললে ঠিক বলা হবে না। সেখানে উন্নয়ন হচ্ছে, আরও হবে।

তবে শুধু জলপাইগুড়ি নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গেরই সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবা হচ্ছে। এটা চা-বলয়, বিশেষ করে চা শ্রমিকদের কাছে পানীয় জল দেবার কাজ করা হচ্ছে। রোড কানেক্টিভিটি বাড়লেই উন্নয়নের পথে অনেকটা এগনো যায়। তাই প্রত্যেক জেলায় কোথাও জয়েজ ব্রিজ, কোথাও পাকা ব্রিজ বানানো হচ্ছে, যাতে বাঁশ, নৌকা, কলার ভেলা করে বাচ্চাদের আর না পার হতে হয়।

রেল নিয়ে অবশ্যই ভাবনা আছে। এনএফ রেলওয়ে এবং সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছি, রিমাইন্ডারও দিয়েছি। ওরা পুজোর মরশুমে কিছু স্পেশাল ট্রেন চালাবে বলেছে। কিন্তু আমরা চাইছি শুধু স্পেশাল ট্রেন হিসেবে নয়, পারমানেন্ট ট্রেন হিসেবে এগুলো চালানোর জন্য আমরা রেল দপ্তরকে চিঠি দেব। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, পুজোর মরশুমে উত্তরবঙ্গে আসার প্রায় সব ট্রেনেই ৫০০-র বেশি ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে। আর এনজেপি তো জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই পড়ছে।

আর আলাদা মহকুমার ব্যাপারটা রাজ্য সরকার ঠিক করে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেন। জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুর সবে আলাদা হল। এসব কাজ শেষ হতে কিছু সময় লাগে। নতুন পৌরসভা করার জন্য আগে পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। এটা আমার দপ্তর ঠিক করতে পারে না। তবে খালি ময়নাগুড়ি নয়, বক্সিরহাট, ফালাকাটা—এসবকেও পুরসভা করার কথা আলোচনা হচ্ছে, ধীরে ধীরে সব বাস্তবায়িত হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌরভকে দু'টি জেলার দায়িত্ব দিয়েছেন, আর আমাদের এমপি বিজয়কৃষ্ণ বর্মনকে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। সৌরভ ভাল কাজ করছে, পরবর্তীতে হয়ত অন্য কাউকে দায়িত্বটা দেওয়া হবে। সেটা আমাদের দলীয় নেতৃত্ব ঠিক করবেন।

প্রশ্ন: দু'বছর হয়ে তিন বছরে পা দিলাম অথচ জেলার পরিকাঠামো সম্পূর্ণ হতে এখনও বিস্তর বাকি। আরও কতটা সময় লাগবে সঠিক বলতে পারবেন কি? অসুবিধা কোথায় কোথায় রয়েছে, সরকারি আমলাদের গড়িমসি কোথায় কোথায় রয়েছে, সেগুলি নির্দিষ্ট করে জানালে জেলার মানুষ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হবে।

—**সৈকত বসু,** নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার

উত্তর: এ কথাটা ঠিক নয়। আলিপুর নতুন জেলা। মাত্র দু'বছর বয়স। সেখানে ইতিমধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হয়েছে, যেখানে সব ক'টা অফিস এক ছাতার তলায় থাকবে। এক বা দু'বছরে অত বড় বিল্ডিং হয় না। সব ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে, পোস্টও ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। আরও কিছুদিন সেখানে সময় লাগবে। সেখানে রবীন্দ্রভবনের কাজ শুরু হয়েছে, বাটারফ্লাই পার্কের কাজও শুরু হয়েছে। জলনিকাশির জন্য ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। জেলায় প্রচুর জয়েজ ব্রিজ, ফাঁকা ব্রিজের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ফালাকাটাতে বাস স্ট্যান্ড, ফুটবল গ্রাউন্ডের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারেও একটা বাস স্ট্যান্ডের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। একটা সরকার এই রাজ্যে ৩৪ বছর ছিল, কিচ্ছু করতে পারেনি। এসব তারা ভাবতেও পারেনি।

সাংবাদিকের প্রশ্ন নয়, মন্ত্রী প্রত্যেক মাসেই একবার মুখোমুখি হচ্ছেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাঠকের। তাঁদের পাঠানো প্রশ্ন থেকে বাছাই করে মন্ত্রীর সামনে রাখা হচ্ছে সুচিন্তিত উত্তরের আশায়। পাঠককে অনুরোধ, নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্ন পাঠান।

সেখানে এত কম সময়ের মধ্যে এতগুলো স্টেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেটা কিন্তু কম কথা নয়। আদিবাসী এলাকাগুলোর মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। সেখানে পর্যটনের উপর জোর দিয়ে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। এই জেলার বক্সা দুর্গ দেখতে অনেকেই আগ্রহী হয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক বিপ্লবী সেখানে বন্দি ছিলেন। কিন্তু ওই জায়গা পর্যন্ত গাড়ি না যেতে পারায় ইচ্ছে থাকলেও অনেক পর্যটক যেতে পারেন না। রোহিণীতে যাবার জন্য যেমন একটা রাস্তা করা হয়েছিল, তেমনি বক্সা ফোর্টে যাবার জন্য অন্য কোনও বিকল্প রাস্তা করা যায় কি না তা নিয়ে আমরা সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠাব।

প্রশ্ন: কোচবিহার শহরে যখন যাই দেখতে পাই, শহরের একাধিক প্রান্তে টোল আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। শুনেছি এই টোল নেয় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। অথচ যত দূর জানি, শহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পূর্ত দপ্তরের। এই টোলের আদায় করা টাকার পরিমাণ বছরে কত হয় এবং পৌরসভা তা কোন খাতে খরচ করে তা আপনার জানা আছে কি? মৌলিক অধিকার হিসেবে সাধারণ মানুষ এই তথ্য জানতে পারে কি? উত্তরবঙ্গের অভিভাবক হিসেবে জানাবার দায়িত্ব কি আপনি নেবেন?

—**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,** হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

উত্তর: রাজ্য সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে পৌরসভা টোল আদায় করছে। টোল আদায়ের টাকাটা জনগণের যে সমস্ত জনসেবামূলক কাজকর্ম আছে, যেমন ড্রেনের কাজ, রাস্তাঘাটের কাজ, সেগুলোতে খরচ করা হয়ে থাকে। শহরের সব রাস্তা তো পিডব্লিউডি ঠিক করে না। এ ছাড়া পুরসভা নাগরিকদের অন্যান্য অনেক ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে। সেসবেও এই টাকা খরচ হয়। অবশ্য এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পৌরসভা দিতে পারবে। আমি যতটুকু জানি তা বললাম।

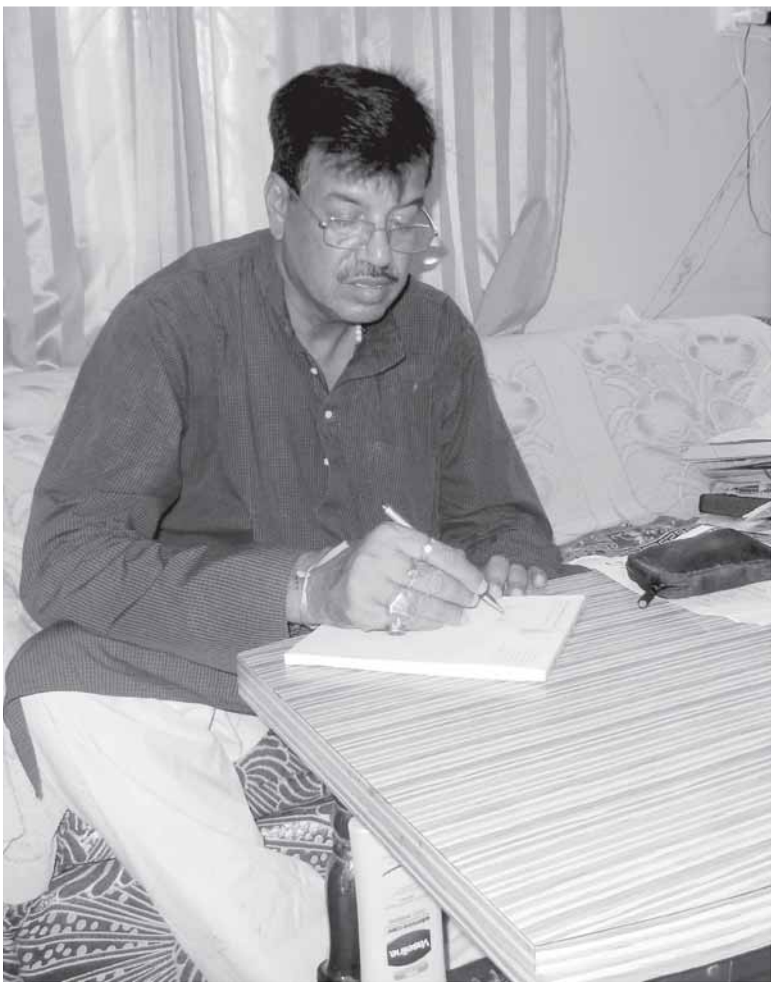

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

জলপাইগুড়িতে আজও দিদির ভরসা সৌরভই

জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার— দু'টি জেলার তৃণমূল সভাপতি হিসেবে সৌরভ চক্রবর্তী বেশ কিছুদিন হল দায়িত্বভার সামলে আসছেন। বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের একতরফা সাফল্যের পর শোনা যাচ্ছিল, সৌরভবাবুকে জলপাইগুড়ির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কারণ, তিনি বিধায়ক হয়েছেন। অনেকগুলি কমিটির দায় সামলাচ্ছেন। দু'টি জেলার সভাপতিত্বের চাপ থেকে তাঁকে মুক্তি দেবেন স্বয়ং নেত্রী। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল যে, জলপাইগুড়ি থেকে জেলা সভাপতি হওয়ার যোগ্য কে হতে পারেন! অতীতে এই জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাউকেই আবার বেছে নেবেন নেত্রী? নাকি নিয়ে আসবেন কোনও নতুন মুখ? ভূতপূর্ব সভাপতি হিসেবে কল্যাণ চক্রবর্তী, চন্দন ভৌমিক এবং কৃষ্ণকুমার কল্যাণী— এই তিনজনের কেউ কি পাবেন জেলার দায়িত্ব? নাকি আসতে পারেন সৈকত চ্যাটার্জি কিংবা মোহন বসুর মতো কংগ্রেস থেকে চলে যাওয়া নেতৃত্ব? নির্বাচনের পর কয়েক সপ্তাহ এই নিয়ে গুজগুজ, ফিসফাস ভেসে বেড়াচ্ছিল রাজগঞ্জ টু ধূপগুড়ি ব্লকের বাতাসে। উঠে আসছিল সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনের নামও।

কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের এই সপ্তাহর পর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি হিসেবে সৌরভকেই রেখে দিচ্ছেন নেত্রী। চটজলদি সৌরভের বিকল্প কেউ নেই বলেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন জেলার রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এর কারণ কী?

দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর মমতা চাইছেন সরকার আর জনগণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক। মাঝখানে দলীয় নেতাদের খবরদারি তিনি আর মানবেন না। দলের নেতাদের ভূমিকা হবে সামাজিক। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে তাঁরা নাক না গলিয়ে নিজ নিজ এলাকায় সামাজিক দায়িত্ব পালন করে সংগঠন করবেন। সম্প্রতি পুর কাউন্সিলারদের সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'নোট নয়, ভোট'। কয়েকটি এলাকার কাউন্সিলারদের পরোক্ষভাবে ধমকেও দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি সরকারি নীতি রূপায়ণে আমলাদের উপরেই বেশি দায়িত্ব এবং ভরসা করবেন। এই অবস্থায় দলীয় নেতাদের 'রাজোচিত' আচরণ কিংবা 'ক্ষমতা প্রদর্শন'— কোনওটাই তিনি বরদাস্ত করবেন না। যাঁরা নেত্রী কথিত 'মিনিমাম' নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন, তাঁদের উপরেই ভরসা করবেন।

দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর মমতা চাইছেন সরকার আর জনগণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক। মাঝখানে দলীয় নেতাদের খবরদারি তিনি আর মানবেন না। দলের নেতাদের ভূমিকা হবে সামাজিক। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে তাঁরা নাক না গলিয়ে নিজ নিজ এলাকায় সামাজিক দায়িত্ব পালন করে সংগঠন করবেন। সম্প্রতি পুর কাউন্সিলারদের সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'নোট নয়, ভোট'। কয়েকটি এলাকার কাউন্সিলারদের পরোক্ষভাবে ধমকেও দিয়েছেন।

এই অবস্থায় দলে ক্ষমতাবান নেতার সংখ্যা যে কমে আসবে, সে নিয়ে দ্বিমত নেই। কারণ, 'মিনিমাম' নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মতো দলীয় নেতার সংখ্যা হাতে গোনা। আগামীতে এই ধরনের নেতারাই দলের প্রকৃত 'সম্পদ' হতে চলেছেন। এঁরাই নেত্রীর 'গুড বুক'-এ অবস্থান করবেন।

সেদিক থেকে বিচার করলে সৌরভ চক্রবর্তী নেত্রীর গুড বুকেই আছেন। তাঁর ভাবমূর্তি বেশ স্বচ্ছ। এখনও অবধি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। একসময় সাহিত্যচর্চা করতেন। লিটল ম্যাগাজিন করতেন। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে এই মুহূর্তে তৃণমূলের আর কোনও নেতা সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে কখনও বিন্দুমাত্র জড়িয়ে ছিলেন বলে জানা যায়নি। তদুপরি মানুষ হিসেবেও সৌরভবাবু বেশ 'ডাউন টু আর্থ'। ডুয়ার্সে রাজনৈতিক হানাহানি, রক্তপাত প্রায় নেই বললেই চলে। বাম-আমলে রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে আইএনটিইউসি করার অপরাধে ১৬ জন শ্রমিককে পুড়িয়ে মারার মতো নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল। তেমন কোনও অঘটন এই সরকারের আমলে ঘটেনি ডুয়ার্সের অন্যতম প্রধান দু'টি জেলায়।

অন্য দিকে, গোষ্ঠীকোন্দল নামক মিসাইলটিকেও সৌরভবাবু বেশ দক্ষ হাতে সামাল দিয়ে আসছেন। জলপাইগুড়ি শহরে শাসকদলের নেতা হিসেবে যাঁরা কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একটা করে 'পার্টি আপিস' স্থাপন করেছেন। ছোট

> একটা সময় পর্যন্ত সৌরভবাবুর মাথাব্যথার কারণ ছিল জলপাইগুড়িতে আদি বনাম নব্য তৃণমূলের সংঘাত। তিনি এমন একজনকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, যিনি জলপাইগুড়ি জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে দলীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন। জেলার ভূতপূর্ব সভাপতিদের মধ্যে কল্যাণ চক্রবর্তী দলের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন বিভিন্ন কারণে।

এই শহরে প্রায় দু'গন্ডা 'আপিস'। বিধানসভায় আলিপুর-জলপাইগুড়িতে শাসকদল প্রচুর সাফল্য পেলেও জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার আসনটি জিততে পারেনি। এর কারণ হিসেবে তৃণমূল সমর্থকের একটা বড় অংশ দায়ী করেছেন গোষ্ঠীকোন্দলকেই। অনুমান করা যায় যে, নেত্রীও টের পেয়েছেন, জলপাইগুড়ি সদর আসনে দলের প্রার্থী ধরতিমোহন রায় হেরেছেন স্থানীয় নেতাদের অক্ষমতায়। সৌরভবাবু এর জন্য দায়ী নন। এই অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি হিসেবে জেলার কোনও নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া মানে সংগঠনের বারোটা বাজানো।

অন্য দিকে, লো প্রোফাইলে থাকা একজন নেতার নীরব অথচ সক্রিয় উপস্থিতি সৌরভবাবুকে অক্সিজেন জোগাতে শুরু করেছে জলপাইগুড়িতে। এই নেতা হলেন জেলার কৃষকসভার সভাপতি দুলাল দেবনাথ। বস্তুত, দুলালবাবুকে জলপাইগুড়ির দায়িত্ব সঁপে দিয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছেন সৌরভবাবু। দুলালবাবুর নিজস্ব কোনও পার্টি আপিস নেই। কিন্তু দলের দু'গন্ডা আপিসের প্রত্যেকটিতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত। যাবতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তিনি নিজেকে চমৎকারভাবে স্থাপন করেছেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারেন এবং নিজেকে জেলার সভাপতি হিসেবে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এইরকম একজন সঙ্গী পাওয়ায় সৌরভবাবুর কাঁধের বোঝা যে অনেকটাই লাঘব হয়েছে, তা এক বাক্যে মেনে নিচ্ছেন জেলার সাধারণ তৃণমূল কর্মীরা।

বস্তুত, একটা সময় পর্যন্ত সৌরভবাবুর মাথাব্যথার কারণ ছিল জলপাইগুড়িতে আদি বনাম নব্য তৃণমূলের সংঘাত। তিনি এমন একজনকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, যিনি জলপাইগুড়ি জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে দলীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন। জেলার ভূতপূর্ব সভাপতিদের মধ্যে কল্যাণ চক্রবর্তী দলের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন বিভিন্ন কারণে। চন্দন ভৌমিক এসজেডিএ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে নেত্রীর 'ব্যাড বুক'-এ চলে গিয়েছেন। কৃষ্ণকুমার কল্যাণী কোনও দুর্নীতিতে জড়িয়ে না থাকলেও দলের সর্বস্তরের কর্মীদের সঙ্গে মিশতে ব্যর্থ। জলপাইগুড়ি শহরের পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে তাঁর দলেরই কাউন্সিলার সৈকত চ্যাটার্জি একদা দুর্নীতির অভিযোগ প্রবলভাবে উত্থাপন করেছিলেন। পুরপ্রধান মোহন বসুর অনুরাগীরা সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনকে সভাপতি হিসেবে দেখতে চাইলেও বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ কান পাতলেই শোনা যায়। ফলে এঁদের কোনও একজনকে জেলার দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না সৌরভবাবুও। এই অবস্থায় দুলাল দেবনাথের উত্থান। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে দুলালবাবুর দলপ্রীতি এবং সাধারণ তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে মিশে যাওয়ার সহজাত ক্ষমতা অনেকটাই নিশ্চিত করেছে সৌরভবাবুকে। এই সংবাদ কালীঘাট অবধি পৌঁছে গিয়েছে।

ফলে আপাতত সৌরভবাবুই থাকছেন আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি জলপাইগুড়ির সভাপতি হিসেবে। যদি ভবিষ্যতে তাঁর দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায় এবং জলপাইগুড়ির জন্য ফুল টাইম সভাপতি নিয়োগের প্রয়োজন হয়, তবে সেই পদটি দুলাল দেবনাথই লাভ করবেন বলে জেলার সাধারণ ঘাসফুল সমর্থকরা মনে করছেন। দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে তৃণমূলের লোক তৃণমূলকে খুন করে গ্রেপ্তার হচ্ছে— এই সংবাদ এখন প্রকাশ্যে। নেত্রীর চরম হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এই কোন্দল ভবিষ্যতে যে আরও চরম হয়ে উঠবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পারার মতো নেতা-নেত্রীদের সব চাইতে বেশি দরকার হবে তৃণমূল সুপ্রিমোর। সৌরভবাবুর সৌভাগ্য যে, তিনি দুলাল দেবনাথকে পেয়ে গিয়েছেন জলপাইগুড়িতে। সুতরাং দু'টি জেলার দায়িত্ব তিনি নিশ্চিন্তে পালন করতে পারবেন আগামী দিনগুলিতে।

তাই জলপাইগুড়িতে নেত্রীর ভরসা এখন সৌরভ এবং সৌরভের ভরসা দুলাল।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

দূরবিন

উৎসব আসন্ন তবু চা বাগানে এখনও বিষণ্ণ অনিশ্চয়তা

এবারের বন্যায় ডুয়ার্সে চা-বাগানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কত? তার হিসেব চলছে এখনও। একেই অনিশ্চয়তার মেঘ, তার উপর বন্যার করাল গ্রাসে জেরবার বিধ্বস্ত ডুয়ার্সের হতভাগ্য চা-বাগানগুলি। নতুন চা ডাইরেক্টরেট গঠন হয়ে গেল বেশ কয়েক দিন, বরাদ্দ ঘোষণাও হয়ে গেল। কিন্তু আসলে কাজ কতটা এগোল তার কোনও খবর নেই চা বলয়ে। সংবাদ মাধ্যমগুলিও আশ্চর্য চুপচাপ। চা-শিল্পকে ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি জোগাতে নতুন সরকারের অভিনব উদ্যোগ কি উৎসবের আগে ফিরিয়ে আনতে পারবে চা-শ্রমিকের মুখে সেই অনাবিল হাসি?

সামনেই পুজো অর্থাৎ বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসব। এই উৎসবকে এখন আর শুধু বাঙালির উৎসব বলে চিহ্নিত করা যায় না। এই উৎসব আজ এক সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। কে কোন ভাবে, কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী, কোন জাতি বা উপজাতি— কোনও কিছুর পরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে একে এখন আর বন্দি করে রাখা যায় না। উৎসবের অর্থ আনন্দের বণ্টন। প্রশ্নটা এখানেই। মনের ভাণ্ডারে যদি আনন্দই মজুত না থাকে, তবে তার বণ্টনের কোনও প্রশ্নই থাকে না।

প্রাচীন অতীতে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে দেখেছিল, শারীরিকভাবে পৃথিবীর দুর্বলতম প্রাণী হিসাবে তাদের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন এবং একের প্রয়োজনে আরেকজনকে তার পাশে দাঁড়ানো। তারা যখন কিছু শিকার করত, তখন সেই শিকারটি কারও একক সম্পত্তি বলে গণ্য হত না। আগুন জ্বালাতে শেখার পর সেই শিকার মাঝখানে রেখে তার চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে সবাই পশুশক্তির বিরুদ্ধে তাদের এই বিজয়ের আনন্দকে বণ্টন করার আনন্দকে উপভোগ করত। কালক্রমে এই আনন্দবণ্টনই নানাভাবে পালিত হতে শুরু করল। বিশেষ করে এই উৎসবের অধিকাংশই ছিল উৎপন্ন ফসল বা জীবিকাকে কেন্দ্র করে। যেহেতু তখনকার জীবিকা ছিল কৃষি তথা ফসল ফলিয়ে ঘরে আনার সময়, তাই এই উৎসবগুলো হতে শুরু হল ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে। কালক্রমে বিভিন্ন ঋতু এর জায়গা নিল।

উত্তরবাংলার দার্জিলিং-তরাই ও ডুয়ার্সের যে সবুজ তরল সোনার ঢেউয়ে চা শ্রমিকদের ব্যস্ততা ও মহিলা শ্রমিকদের সেই কোমল আঙুলের স্পর্শের জাদুতে পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে দু'টি পাতা ও একটি কুঁড়ির ফসলের আনন্দের সঙ্গে তাদের দেহাতি সুরের ঐকতান, চা গাছের পাতায় পাতায় ছন্দ তুলে মাথার উপর নীল আকাশে ছড়িয়ে দিত সেই আনন্দের বার্তা।

কারণ মানুষ আপন অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছিল, কোন ঋতুতে কী ফসল ফলে এবং তার বিক্রয়লব্ধ সম্পদ বা অর্থ তার হাতে আসে, যা দিয়ে সে তার আনন্দকে আরও সবার মধ্যে বণ্টন করতে পারবে।

বাংলায় শরৎকাল ছিল সেরকমই একটা মাস। তাই শারদ উৎসব বা দুর্গা দেবীর বোধনের মধ্যে আনন্দকে সবার মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া হত। তাই এই উৎসবের আনন্দলহরি ছড়িয়ে পড়ত বাংলার বাঙালির ঘরের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিটি জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

উত্তরবাংলার দার্জিলিং-তরাই ও ডুয়ার্সের যে সবুজ তরল সোনার ঢেউয়ে চা শ্রমিকদের ব্যস্ততা ও মহিলা শ্রমিকদের সেই কোমল আঙুলের স্পর্শের জাদুতে পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে দু'টি পাতা ও একটি কুঁড়ির ফসলের আনন্দের সঙ্গে তাদের দেহাতি সুরের ঐকতান, চা গাছের পাতায় পাতায় ছন্দ তুলে মাথার উপর নীল আকাশে ছড়িয়ে দিত সেই আনন্দের বার্তা। আসছে আগমনি। হাতে আসবে বোনাসের টাকা। বাগান থেকে শহরে যাবে তার মরদের সঙ্গে। কিনবে শাড়ি। কিনবে গতবারে দেখে আসা পছন্দের কাচের বাসন। হাঁড়িয়া খাওয়ার নেশা কমিয়ে দু'টাকা-পাঁচ টাকা করে জমিয়েছে কিছু। বোনাস যোগ করলে যদি কেনা যায় একটা টিভি, নয়ত শহরের বাবু-বিবিদের হাতে ধরা দামি না হলেও সবচেয়ে সস্তা একটা মোবাইল ফোন। বাড়িতে জ্বলে কেরোসিনের আলো। তবে ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছে বিদ্যুৎ।

এবারে উৎসব আসন্ন কিন্তু সেই কোলাহলমুখর সবুজ তরল সোনার সাম্রাজ্যে কেমন একটা শেওলা জমা তামার মতন মলিনতা। আনন্দের পরিবর্তে বিষণ্ণ মুখে এসে জমা হচ্ছে অনাহারক্লিষ্ট মৃত্যুর ছায়া। ভোরের কাজের সাইরেন ভেসে আসছে না অনেক বাগান থেকে। অথচ দু'টি কান উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সেই পরিচিত কাজের আহ্বানের ডাক শুনতে। কেজো দু'টি হাতের মাংসপেশিগুলো পাকস্থলীর রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে শুধু হাতের উপর চামড়াটাকে রেহাই দিলেও অভুক্ত দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় বাগানের সামনে। ফ্যাক্টরির দরজা বন্ধ। তবু হাত বাড়ায় তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা বিবর্ণ চা গাছের ঝোপের দিকে। শ্রমিকরা যেমন চেনে এর প্রতিটি পাতাকে, এই গাছের পাতাগুলোও তো তেমনই চেনে এই মানুষগুলোকে। এদের সঙ্গে যে এই গাছগুলোর জন্মমুহূর্ত থেকেই নিবিড় আত্মীয়তা। এদের পরিচর্যায় এই সবুজ সাম্রাজ্যের পাতাগুলোই এতদিন তরল সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে। গড়ে দিয়েছে চা-বাগিচা মালিকদের ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য। এরা অবশ্য বাগানের মালিককে চেনে না। চেনে এইসব শ্রমিককে। এই চেনাটা শুরু হয়েছিল শ্রমিকদের ফোঁটা ফোঁটা ঘামের স্পর্শে।

যে ঢাক একদিন আনন্দের বার্তাবহ ছিল, সেই ঢাকের শব্দ এখন বন্ধ চা-বাগানে আনে স্মৃতির বিষাদের সুর। বুকটা মোচড় দেয় কুলি বস্তির ভাঙা ঘরের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বন্ধ থাকা বাগানের দিকে তাকিয়ে। এই তো সেই দিনের কথা! চলত বোনাস নিয়ে আলোচনা। মাঝে মাঝেই খবর আসত— হচ্ছে, হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের বাবু-নেতাদের সঙ্গে মালিক-বাবুদের কথা চলছে। কখনও খবর আসত, ভেঙে যাচ্ছে আলোচনা। মালিকরা লাভ করেছে। সেই লাভের সামান্য একটা অংশ কম নিয়ে তাদের বোনাসের পরিমাণ এক টাকাও বাড়াতে চাইছে না। তবু তারা কাজ চালিয়ে যেত। বাগান আছে, ট্রেড ইউনিয়ন আছে। পাওয়া যাবে অবশ্যই কিছু। ধর্মঘটের ডাক এলে বাগানের কাজ বন্ধ হলেও আসত চা গাছগুলোর কাছে। এরা যে তাদের সন্তান। আবার চা গাছের কাছে এই শ্রমিকরাও তাদের সন্তান। এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক। একে না থাকলে অপরের জন্ম হয় না। চা শ্রমিকরা না এলে চা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে না, আবার চা গাছ না থাকলে চা শ্রমিকের অস্তিত্ব থাকে না।

উত্তরবঙ্গের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এই চা-বাগিচার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের মরণবাঁচনের প্রশ্নে জড়িয়ে আছে। এর আগে ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার। তখন চা সাম্রাজ্যে শ্রমিক সংগঠন বলতে সর্বত্রই বাম। ডাইনেও বাম, বামেও বাম। শ্রমিকরা কোনও কিছুই পায়নি— এটা

বলা যাবে না। তবে শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রোজগারের প্রশ্নে প্রাথমিক যে দায়িত্ব, সেটা হল রুটি-রোজগারের নিরাপত্তা। তার কোনও স্থায়ী কার্যক্ষম ব্যবস্থা শ্রমিক-কৃষক রাজ্য সরকার বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বে নেওয়ার সাহস দেখায়নি। তবে শ্রমিকের অধিকারের নামে যত খুশি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার দিয়ে তাদের বাম-গণতন্ত্রের প্রমাণ রাখতে চেয়েছিল। একমাত্র ডুয়ার্সের চা-বাগানেই সৃষ্টি হল ৩২টি ট্রেড ইউনিয়ন। এদের প্রায় সবারই একই স্লোগান— ইনকিলাব জিন্দাবাদ, অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। অথচ মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের দাবির যত বেশি কাউন্টার বা জানালা খোলা থাকবে, ততই যে মালিকের লাভ— এই সহজ সত্যিটা বাম-নেতারা জানতেন না এমন হতেই পারে না। তাই তো সন্দেহ জাগে, এটা মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে হয়নি তো? বিশেষ করে এক-একটা বাগানে তারকেশ্বর লোহারদের মতন নেতাদের রমরমা অবস্থা দেখে এমন একটা সন্দেহ অত্যন্ত জোরালোভাবেই দানা বাঁধে।

তৃণমূল সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য তাদের শাসনের ইনিংস শুরু করেছে। তাদের বিজয় অভিযানের পতাকার গৌরব মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের অধিকাররক্ষার প্রতিষ্ঠার সূচকের মাধ্যমে ঘোষিত হচ্ছে না। এই বিজয়ের ঘোষণা ঘোষিত হচ্ছে চা-বাগিচায় ঝান্ডা বদল ঘটাবার সাফল্যের মাপকাঠিতে। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করেন গমন— সেই আপ্তবাক্যকে অনুসরণ করে একই পথ ধরে সর্বত্রই তৃণমূলের সংগঠনের দখলদারিকে বিজয় বলে ঘোষণা করছেন।

তরুণ বিধায়ক ও কাজের মানুষ বলে পরিচিত সৌরভ চক্রবর্তীর জলপাইগুড়ি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েই বৈপ্লবিক ঘোষণা, বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা যদি সমবায় করে বাগান চালাতে চায়, তবে তাঁর ব্যাঙ্ক তাদের আর্থিক সহয়তা দিতে এগিয়ে আসবে। 'এখন ডুয়ার্স' সৌরভ চক্রবর্তীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাবার পাশাপাশি তাঁকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নবগঠিত টি ডিরেক্টরেট-এর চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করার ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছিল, তরুণ যোগ্য নেতৃত্বের হাতে এই দায়িত্ব অর্পণ করায় এই টি ডিরেক্টরেট নিছক একটা আলংকারিক প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকবে না, চা-বাগিচা ও চা শ্রমিকদের অধিকাররক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ ও তাকে রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এখনও পর্যন্ত এই দপ্তর কিন্তু কোনও কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেনি। এই প্রসঙ্গে জানার জন্য শ্রীচক্রবর্তীর কাছে বারবার ফোনে যোগাযোগ, এমনকি মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়েও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।

বন্যায় এবার ডুয়ার্সের চা-বাগানে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সঠিক জানা না থাকলেও নেহাত কম নয়। ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে এবারও আদৌ বোনাস মিলবে তো? নাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাতে ওসব কপালে জুটবে না? আসলে এবার তো ব্যাপারটা একটু হলেও আলাদা। এবার ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা হয়েছে নতুন চা-ডাইরেক্টরেট। তাদের প্রশাসনিক অধিকার কতটা দেওয়া সম্ভব তা এখনও পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও এটুকু পরিষ্কার যে বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করা হবে শ্রমিক কল্যাণে, বাগান সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাট পরিকাঠামো উন্নয়নে। সেই আশায় বুক বেঁধেছিল দুস্থ চা বলয়ের মানুষ। বন্যায় হাজার ক্ষতি হলেও তারা অধীর আশায় তাকিয়ে আছে নতুন ডাইরেক্টরেটের দিকে। কিন্তু পুজোর তো আর বাকি হপ্তা পাঁচেক, এখনও চা-ডাইরেক্টরেট থেকে কোনও ঘোষণা নেই, স্বভাবতই উজ্জীবিত মানুষগুলির আশার বহরে কাটছাঁট শুরু হয়েছে। আর নিন্দুকেরা মুচকি হেসে টিপ্পনি কাটছে, আশায় মরে চাষা।

চা-বাগিচায় যদি শারদ আনন্দের বার্তা বয়ে না আসে, সেই বিষণ্ণতা শুধু চা শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। শ্রমিকের রোজগার না থাকলে বাজারে জিনিস আসবে বটে, ক্রেতা আসবে না। ডাক্তার চেম্বারে ওযুধ সাজিয়ে বসবেন, রোগ ও রোগীর সংখ্যা বাড়লেও চেম্বারে রোগী আসবে না। ওযুধ কেনার অর্থ নেই। সিনেমা হলে প্রিয় নায়ক-নায়িকার ছবি আসবে, দর্শক নেই। টিকিট কেনার অর্থ নেই। সিনেমা হলের সামনে বাদাম, চায়ের ডালা নিয়ে বসবে, ক্রেতার ভিড় নেই। ব্যাঙ্কের ঋণের অর্থে লেদ মেশিনের দরজা খোলা। কাজ নেই। বন্ধ চা-বাগান থেকে মেশিন সারানোর প্রশ্নই নেই। শহরের দোকানগুলো নানা পসরা নিয়ে দোকান সাজাবে। খরিদ্দার নেই, কারণ বাগানে বোনাস নেই।

এটা মনে করার কোনও কারণ নেই, চা-বাগিচা শিল্পে আলো না থাকলে শহরের রাস্তায় হ্যালোজেনের আলো জ্বলবে। বাংলার এই শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিনেও সারা চা সাম্রাজ্যে ভয়ংকর নিরানন্দের ছায়া। সরকারের করণীয় অনেক। সেই দায়িত্ব পালন করে চা-বাগিচা সাম্রাজ্যের শারদ উৎসবের আনন্দবার্তাকে আনুক সরকার— এটাই প্রত্যাশা।

সৌমেন নাগ

'এখন ডুয়ার্স'-এর গ্রাহক সংক্রান্ত কথা

আমরা দুঃখিত, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং কাগজে এর আগে ঘোষণা সত্ত্বেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক নেওয়া শুরু করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠকের ঠিকানায় পত্রিকা পৌঁছাবার নেটওয়ার্ক আমরা এখনও তৈরি করে উঠতে পারিনি। আমরা প্রতিনিয়ত বহু ফোন এবং মেল পাই গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ নিয়ে। সকলের কাছে আমাদের একটাই উত্তর, যেখানে যেখানে বাড়িতে/অফিসে কাগজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বার্ষিক গ্রাহক হওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই— পত্রিকা এমনিতেই আপনার কাছে পৌঁছাবে। আর প্রত্যন্ত এলাকার পাঠকদের অনুরোধ করব, আপনারা নিকটবর্তী কাগজবিক্রেতার স্টলে আগাম বলে রাখলে 'এখন ডুয়ার্স' আপনার জন্য রাখা থাকবে। পাঠকের এই ভালবাসা মূলধন করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

(পত্রিকা না পেলে ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে)

ডুয়ার্সের অচেনা ত্রয়ী কুমাই-দলগাঁও-রঙ্গো

কুমাই হোম স্টে

দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট

কুমাই

কুমাই— উত্তরবঙ্গের একটি অপ্রচলিত ও অনাবিষ্কৃত গন্তব্য। যার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। যদিও এর অবস্থান দার্জিলিং জেলায়, তবে জলপাইগুড়ি বা ডুয়ার্সের খুব কাছে কুমাই। কিছুদিন হল গ্রামীণ পর্যটন শুরু হয়েছে এখানে। প্রায় ১০ হাজার মানুষের বসবাস। এরা মূলত বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টান এবং নেপালি এদের মাতৃ ভাষা তবে হিন্দি ও ইংরেজি বলতে পারে। এরা চাষবাস করে বা চা বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

'অর্গানিক চা' এবং হিমালয়ের আতিথেয়তার জন্য কুমাই পরিচিত। এখান থেকে মেটেলি বাজার মাত্র ১২ কিলোমিটার।

থাকার ব্যবস্থা: কুমাইতে থাকার জন্য তিনটি হোম স্টে আছে, আরও অনেক তৈরি হচ্ছে। এদের মধ্যে সবথেকে ভাল হোম স্টে হল 'ইয়োনজোনলা হোম স্টে'। খরচ মোটামুটি ১০০০ টাকা প্রতিদিন জন প্রতি (খাওয়া সহ)।

পর্যটকরা এখানে সময় কাটাতে পারেন পাখি দেখে, গ্রামের রাস্তায় ট্রেকিং করে, মাছ ধরে, অর্গানিক চা তৈরি দেখে এবং স্থানীয় বিভিন্ন পদ রান্না করে।

এখান থেকে কাছাকাছি যে জায়গাগুলো দেখা যায় সেগুলি হল, দুশো বছরের পুরানো বৌদ্ধ স্তূপ, গ্রিন ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত, হ্যালি ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যোদয়, গুদারায়া ভিউ পয়েন্ট, লালিগুরাস ভিউ পয়েন্ট, অর্গানিক চায়ের বাগান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, রাবার প্লান্টেশন।

কীভাবে যাবেন: নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিউ মাল জংশন ২৫ কিমি। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন ৮৫ কিমি, করোশেন ব্রিজ, বাগরাকোট ও চালসা হয়ে। বাগডোগরা বিমানবন্দর ১০০ কিমি।

কুমাই

কুমাই হোম স্টে

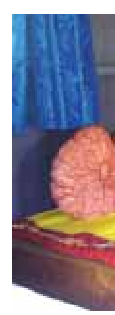

দলগাঁও

বিখ্যাত সব গন্তব্য যেমন সামসিং, সুনতালেখোলা, প্যারেন, ঝালং, বিন্দু, নেওড়া ভ্যালির কাছেই দলগাঁওয়ের অবস্থান। পুরানো দিনের অনেক কিছু দেখা যায় এই দলগাঁওতে। যেমন ভারতের সবথেকে প্রাচীন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ‘জলঢাকা প্রজেক্ট’। এছাড়া ও প্রাচীনতম সিনকোনা চাষের জায়গা, যেখানে এখনও হাতে করে কুইনাইন বড়ি তৈরি হয়। শুধু হোম স্টেতে থেকে গ্রামীণ পর্যটন নয়, নেওড়াভ্যালি জঙ্গলে ট্রেক, জলঢাকা নদীতে অ্যাডভেঞ্চারও করা যেতে পারে।

তামুধে হোম স্টে

তামুধে হোম স্টে

মিচিলিংমা হোম স্টে

মিচিলিংমা হোম স্টে

থাকার ব্যবস্থা: এখানে দুটি হোম স্টে আছে। তারা হল ‘মিচিলিংমা হোম স্টে’ ও অন্যটি ‘তামুধে হোম স্টে’। খরচ ১০০০ টাকা প্রতিদিন জন প্রতি (খাওয়াসহ)।

কাছাকাছি দেখার মধ্যে আছে সিনকোনা প্ল্যান্টেশন, দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট, রঙ্গো মনেস্ট্রি, জিরো পয়েন্ট ও দূরবর্তী গ্রাম।

কীভাবে যাবেন: নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিউ মাল জংশন ৪৬ কিমি। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন ১২০ কিমি, করোশেন ব্রিজ, বাগরাকোট ও চালসা হয়ে। বাগডোগরা বিমানবন্দর ১২৮ কিমি।

রঙ্গো

উত্তরবঙ্গের এক লুকানো পাহাড়ি গ্রাম হল ‘রঙ্গো’। এটাই হল ভারতের শেষ সীমানা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৬০০ ফুট উঁচুতে এর অবস্থান। এই গ্রাম সিনকোনা গাছে ঘেরা। গ্রামের প্রায় সব মানুষই এই সিনকোনা চাষের উপর নির্ভর করে। এই ছোট্ট গ্রামে বাজার, পোস্ট অফিস ও কিছু বাড়িঘর আছে। রঙ্গো ওষুধ তৈরিতে লাগে এমন গাছগাছড়ার চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ বৌদ্ধ ও হিন্দু। এদের মাতৃভাষা নেপালি।

এখানে থাকার জন্য একটি মাত্র হোম স্টে আছে, ‘রাইজিং সান হোম স্টে’। খরচ জনপ্রতি ১০০০ টাকা প্রতিদিন খাওয়া সহ।

এখানে দেখা যায় সিনকোনা চাষ, দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট, জিরো পয়েন্ট, রঙ্গো মনেস্ট্রি, সানসেট পয়েন্ট।

কীভাবে যাবেন: নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিউ মাল জংশন ৫৩ কিমি। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন ১২৭ কিমি, করোশেন ব্রিজ, বাগরাকোট ও চালসা হয়ে। বাগডোগরা বিমানবন্দর ১৩৫ কিমি।

দলগাঁও থেকে রঙ্গোর দূরত্ব মাত্র ৭ কিলোমিটার, এই দুই স্থান একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

বুকিং ও অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে ওসান লেপচা-র সঙ্গে। ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ ৯৯৩২৩ ৮৫৪৯৪, ইমেল oshanlepcha@yahoo.com।

রঙ্গো হোম স্টে

দক্ষিণ দিনাজপুর মাছ উৎপাদনে সেরা, তবু কেন মাছের আকাল

ঘটনা-১

বালুরঘাটের সুকুমারবাবু। সুকুমার মিত্র। বড়বাজারে গেলেন। মেয়ে-জামাই এসেছে। সাধ, জামাইকে ইলিশ খাওয়াবেন, সঙ্গে নাতনিটার জন্য একটু দেশি মাগুর মাছ নেবেন। ইলিশের সঙ্গে দেশি মাগুর কিনে বাড়িও ফিরলেন। পরে উদ্ধার হল যে ওটা দেশি মাগুরই নয়। দেখতে একদম এক। কিন্তু আসলে আলাদা।

ঘটনা-২

গঙ্গারামপুরের শ্যামল সরকার। অনেকদিন পর রবিবারের বাজারে ঢুকেছেন। গতকাল রাত থেকেই তাঁর ইচ্ছে, অনেকদিন তেল-কই খাওয়া হয়নি। তাই আজ ভাল দেখে দেশি কই কিনবেন। মনের সুখে কই কিনে বুক ফুলিয়ে বাড়িতে নিয়েও গেলেন। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে এটা দেশি কই নয়। আসলে ভিয়েতনামি কই।

ঘটনা-৩

সুনীলবাবুর বাড়িতে ছেলের বউভাতের অনুষ্ঠান। ওঁর দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে, ছেলের বউভাতে নিমন্ত্রিত অতিথি-আত্মীয়স্বজনদের দেশি রুইয়ের কালিয়া খাওয়াবেন। কিন্তু হায়! অন্ধ্রের রুই ছাড়া রুই অমিল।

এই ঘটনা দৈনন্দিনের। এই ঘটনা দক্ষিণ দিনাজপুরের। যখন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা নিজেরাই বলছেন যে, মাছ উৎপাদনে গোটা পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে পিছনে ফেলে আমরাই এক নম্বর। সেখানে এই দুর্দশা কেন? কেন মাছের বাজার দখল করে আছে বিদেশি, ভিনদেশি, হাইব্রিড মাছ? কেন মাছের এই আকাল মৎস্য উৎপাদনে সেরা জেলায়? যাচ্ছে কোথায় সব মাছ? আর তাহলে নদীতেই বা মাছের হাহাকার কেন? অতি সম্প্রতি মৎস্য দপ্তরের এক আলোচনাসভায় উঠে এল এমনই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য।

কী উঠে এল আলোচনায়?

দক্ষিণ দিনাজপুরের মৎস্য দপ্তরের আয়োজনে অতি সম্প্রতি যে আলোচনাসভা হয়ে গেল, তার শিরোনাম ছিল 'সাসটেইনেবল ফিশারি রিসোর্সেস অব দক্ষিণ দিনাজপুর অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল এফেক্টস'। তাতে মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক থেকে পরিবেশবিদ, মৎস্য গবেষক, এমনকি মৎস্য উৎপাদকরাও ছিলেন। তাতেই উঠে এল ভয়ংকর সব তথ্য। জেলার পুকুরগুলিতে যে সম্পন্ন মৎস্য চাষিরা ব্যাপক পরিমাণে রুই, কাতলা এবং অন্যান্য ছোটবড় মাছ উৎপাদন করছেন তা আর জেলার মাছের বাজারে থাকছে না, পাড়ি দিচ্ছে বাইরের বাজারে। ফলে দেখা দিচ্ছে মাছের আকাল। আর সেই সুযোগে স্থানীয় মাছের বাজার দখল নিচ্ছে বিদেশি, ভিনদেশি মাছ। এমনকি চারাপোনা, ধানিপোনারাও আসছে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে।

তাহলে যাচ্ছে কোথায় মাছেরা? কেন?

কোথায় আবার? এ জেলার মাছ সব শিলিগুড়ি, পূর্ণিয়া, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের অন্যান্য জেলা, কলকাতায় যাচ্ছে। কেন আবার? বেশি দাম পাচ্ছে তাই। জেলার এক মৎস্য উৎপাদক, সম্প্রতি যিনি 'কৃষকরত্ন'

সম্মানে রাজ্য সরকার কর্তৃক সংবর্ধিত হলেন, সেই কুশমন্ডির জীবনানন্দ সিংহ বলছেন, 'আমরা মাছ উৎপাদন করি প্রচুর। আমার নিজেরই হ্যাচারি আছে। কিন্তু বেশি লাভের আশায় সব মাছ চলে যাচ্ছে বাইরের বাজারে। তাই স্থানীয় বাজারে মাছের দামও বেশি। আর ২০ শতাংশ বাজার দখল করে আছে বিদেশি মাছ।'

মাছ আসছে চোরাপথে?

এপার থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে, বলা ভাল, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে গোরু, জিরা, লবণ ইত্যাদি যাচ্ছে শুধু নয়, বাংলাদেশ থেকেও আসছে। পাবদা, ট্যাংরা, চিতল, কই, পাঙাশ, ভিয়েতনামি কইয়ের চারাপোনা, ধানিপোনারা সব বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে এ রাজ্যে আসছে। এও এক পাচারের কাহিনি। এ জেলার মৎস্য চাষিরা জানাচ্ছেন, সবই চলছে চোরাপথে। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এ এক ভয়ংকর সংকট।

তাহলে তো রোগও আসছে পাচার হয়ে?

মৎস্য দপ্তর সূত্রে খবর, বিদেশি মাছের হাত ধরে অনেক রোগও আসছে। কারণ এই বিদেশি মাছগুলি শরীরে কী রোগ বহন করছে তা তো আমরা জানি না। পাবদা, ট্যাংরা, চিতল, কই, পাঙাশ, ভিয়েতনামি কই, চায়না মাগুর, বিভিন্ন এগজটিক মাছ চোরাপথে আসছে, আর তাদের শরীরে থাকা রোগ আমাদের শরীরেও প্রবেশ করছে।

এদিকে নদীতে মাছের আকাল

এ এক উলটপুরাণ। জেলা মাছ উৎপাদনে সেরা অথচ নদী-নালা-খাল-বিলে মাছ নেই। দেশীয় মাছ নেই। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে গিয়ে পাচ্ছে না। বাইখরের আকৃতি ছোট হয়েছে, স্বাদ কমেছে। বাঘা আড়, মহাশোল, পুতুল মাছরা হারিয়ে গিয়েছে। চ্যালা, বেলে, খলশেরাও হারিয়ে যাওয়ার পথে। ছোট্ট ছোট্ট পুঁটি, ট্যাংরা, বাটা দিয়ে কোনওরকমে কাজ চলছে। নদীতে মাছ না পেয়ে মৎস্যজীবীরা পেশা বদল করছে। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভিন দেশে যাচ্ছে কাজের খোঁজে।

মশারি জালও তো নিষিদ্ধ হয়নি

এক মৎস্য গবেষক বলছিলেন, নদীতে, খাঁড়িতে মাছ থাকবে কী করে? মশারি জাল তো নিষিদ্ধই হয়নি। এমনকি এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যও শোনা যায় না। মশারি জাল এমনই একটা জাল, যা মাছের বংশ নির্বংশ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই কোনও কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না। অবিলম্বে মশারি জাল নিষিদ্ধ না হলে সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

দূষণও কি নেই?

নদী-খাঁড়িতে মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ দূষণ। নদীর বুকে চাষবাস হচ্ছে। কীটনাশক মিশছে জলে।
নদী-খাঁড়িতে বিসর্জন দেওয়া প্রতিমার গায়ে থাকে ল্যাকার, ক্রোমিয়াম, লেড, হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়ামের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক। এগুলোও জল দূষণ ঘটায়। অনেক জলাশয়ে ইউট্রোফিকেশন বা পরিপোষকঘটিত জল দূষণ একটা বড় সমস্যা। নদী, জলাশয়গুলি এখন হয়েছে এক-একটা ডাস্টবিন। গ্রাম-শহরের সমস্ত বর্জ্য ফেলা হচ্ছে সেখানে। ফলে জল দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার মাত্রাও চূড়ান্ত।

মাছ বাইরে যাচ্ছে, হয়রানিও তো!

চূড়ান্ত হয়রানি। রাতে মাছের গাড়িগুলিতে পুলিশের অত্যাচার চূড়ান্ত। যে গাড়িগুলিতে মাছ নিয়ে যাওয়া হয়, সেগুলি মালবাহী অর্থাৎ মৃত বস্তু নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু মাছ তো জীবন্ত। এই কায়দায় পুলিশ রাস্তা আটকায়, টাকা নেয়, জুলুম করে— বললেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক মৎস্য উৎপাদক। বারবার জানিয়েছি, এখনও সুরাহা হয়নি। সামান্য একটু লাভের আশায় আমাদের হয়রানির সীমা নেই। মৎস্য দপ্তর থেকে যদি একটা কার্ড করে দেওয়া হত আমাদের পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম।

পরিস্থিতি অদ্ভুত!

হ্যাঁ, অদ্ভুতই তো! একদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচুর মাছ উৎপাদন হয় অথচ সেই মাছ জেলায় থাকে না। সেই মাছের বাজার দখল করে আছে বিদেশি মাছ, যা আসছে চোরাপথে। দেশীয় মাছ নেই। গভীর সংকটে মাছের ভবিষ্যৎ। ক্রেতারা মাছ কিনছেন চড়া দামে। কী প্যারাডক্স! 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে'— জেলাবাসী বলছেনও, আবার বলতেও পারছেন না। এই পরিস্থিতির মুক্তি কবে? কীভাবে? মৎস্য দপ্তর শুনছে তো?

সবুজ মিত্র

ভ্রম সংশোধন

'এখন ডুয়ার্স' ১৭ অগাস্ট সংখ্যায় 'যেখানে নদী মানে ভূগোল নয় ইতিহাস' লেখায় অনবধানতাবশত লেখকের নাম ছাপা হয়নি। লেখাটি তুহিন শুভ্র মণ্ডল লিখেছেন। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় উত্তরের সেরা যুব আবাস

কোচবিহার রাজবাড়ির ঠিক পাশেই কোচবিহার স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে ঢুকলেই কোচবিহার রাজবাড়ির সৌন্দর্য চোখে পড়তে বাধ্য। খেলার মাঠ বাদ দিয়েও এই স্টেডিয়ামের মধ্যে অনেকটা জমি ফাঁকা রয়েছে। বহু বছর ধরে নানা মহল থেকে স্টেডিয়ামের জমিতে একটা সুইমিং পুল বানানোর দাবি উঠলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এই শহরে এখনও একটাও সুইমিং পুল নেই, যা সত্যিই লজ্জার। প্রাণ হাতে করে তাই আজও সাগর দিঘিতে বাচ্চাদের সাঁতার শেখানো হয় সকলের চোখের সামনে। প্রশাসন কোনও কারণে এ ব্যাপারে এক্কেবারে উদাসীন। তবে জানা গিয়েছে, সুইমিং পুল নিয়ে জমিজট কেটেছে। খুব তাড়াতাড়ি স্টেডিয়ামের জমিতে সুইমিং পুল তৈরির কাজ শুরু করা হবে। বাম-ডান কোনও জমানাতেই আজ পর্যন্ত সুইমিং পুল তৈরি না হলেও, স্টেডিয়ামে তৈরি করা হল ইউথ হস্টেল। যুব দপ্তরের অর্থানুকূল্যে তৈরি হওয়া সুদৃশ্য চারতল এই যুব আবাসটি এখন শুধু উদ্‌বোধনের অপেক্ষায়।

এত বছর পর্যন্ত কোচবিহারে কোনও টুর্নামেন্ট বা কোনও খেলা হলে বাইরে থেকে আসা খেলোয়াড়দের থাকার খুব অসুবিধা হত। তাঁদের রাখা হত সাগর দিঘি সংলগ্ন অতিথিনিবাসে বা কোনও হোটেলে। এতদিনে এই সমস্যা মিটল বলে খুশির হাওয়া ক্রীড়ামহলে।

আধুনিক ও প্রাচীন স্থাপত্য মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই যুব আবাসটি। আবাসটির গঠনশৈলীতে আধুনিকতার ছাপ থাকলেও মাথার উপর কোচবিহার রাজবাড়ির আদলে তৈরি করা হয়েছে একটি নয়, দু'টি গম্বুজ। জানা গেল, ২০১৪-তে আবাসটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। চারতল আবাসটিতে রয়েছে মোট ৪২টি ঘর। তার মধ্যে যেমন ডর্মিটারি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভিআইপি ও ভিভিআইপি রুম। যুব আবাসে একসঙ্গে ১১০ জন লোক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। আর রয়েছে বিশাল বড় ডাইনিং রুম, যেখানে ২০০ জন মতো মানুষ একসঙ্গে বসে খেতে পারবে। গোটা যুব আবাসটি তৈরি হয়েছে পিডব্লিউডি'র তত্ত্বাবধানে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি ৫ কোটি ২ লাখ টাকার হলেও, ইউথ অফিসার লোকসাং ডুকপা জানান, এটি

আধুনিক ও প্রাচীন স্থাপত্য মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই যুব আবাসটি। আবাসটির গঠনশৈলীতে আধুনিকতার ছাপ থাকলেও মাথার উপর কোচবিহার রাজবাড়ির আদলে তৈরি করা হয়েছে একটি নয়, দু'টি গম্বুজ। জানা গেল, ২০১৪-তে আবাসটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। চারতল আবাসটিতে রয়েছে মোট ৪২টি ঘর। তার মধ্যে যেমন ডর্মিটারি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভিআইপি ও ভিভিআইপি রুম। যুব আবাসে একসঙ্গে ১১০ জন লোক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

তৈরি করতে ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। বাদবাকি সব কাজ হয়ে গেলেও এখন চলছে আসবাবপত্র তৈরির কাজ, যার দায়িত্বে রয়েছেন কোচবিহারের জেলাশাসক পি উলগানাথন স্বয়ং। এখনও পর্যন্ত এখানে ক্যান্টিনের কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে তা নিয়ে ভাবা হবে বলে জানান যুব আধিকারিক। এ ছাড়াও পরবর্তীতে অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্যও এটি ভাড়া দেবার কথা ভাবা যেতে পারে বলে তিনি জানান।

স্টেডিয়ামের ভিতরের এই যুব আবাসটির উদ্‌বোধন এখনও হয়নি। অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা চলছে বলে জানা গিয়েছে। অথচ সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে দেখা গেল বাম দিকে দেওয়ালে ফাটল ধরার চিহ্ন। যুব আবাস চালু হবার আগেই দেওয়ালে ফাটল ধরার কথা জানতে চাইলে যুব আধিকারিক লোকসাং ডুকপা জানান, ‘আমি প্রায়ই ওখানে যাই, কিন্তু এ ধরনের কিছু কখনও চোখে পড়েনি। আমি বিষয়টি নিশ্চয়ই দেখব।’ এ প্রসঙ্গে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মন জানান, ‘যুব আবাসের দাবি আমাদের দীর্ঘ দিনের। কিন্তু একটা বহুতল নির্মাণ করার সময় যে প্রপার কিওরিং করতে হয় তা এর বেলা হয়নি। এ নিয়ে আমরা যুব দপ্তরকে জানিয়েছি, কাগজে খবরও বেরিয়েছে, কিন্তু যুব দপ্তর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ঠিকমতো জল না পেলে গাঁথনি বা প্লাস্টার ফাটবেই।’

কোচবিহার শহরে এত বড় একটি স্টেডিয়াম থাকা সত্ত্বেও একে কোনওমতেই আধুনিক স্টেডিয়াম বলা যেত না। কোনও বড় খেলা পরিচালনা করার মতো পরিকাঠামো এতদিন ছিল না ক্রীড়া সংস্থার। গত জুন মাসে রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মুখ্যসচিব সৈয়দ আহমেদ বাবা কোচবিহারে এসে জেলা ক্রীড়া সংস্থার বেশ কিছু প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। তাতে মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ড্রেসিং রুম, এসি মাল্টিজিম এবং ৪০০ মিটার অ্যাস্ট্রোটার্ফ রানিং ট্র্যাকের কথা বলা হয়েছিল। এগুলোর অনুমোদন মেলায় খুব দ্রুত কোচবিহার স্টেডিয়াম আধুনিকভাবে সেজে উঠবে— এই আশায় খুশি ক্রীড়াপ্রেমীরা। বর্তমান ইনডোর স্টেডিয়াম সংস্কারের জন্য ক্রীড়া দপ্তর ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে। তা দিয়ে কাঠের মেঝে ঠিক করা হল, রং করা হল, উপর থেকে জল পড়ত তা সারানো হল, আর ভিতরটা সাউন্ডপ্রুফ করা হল বলে ডিএসএ’র তরফ থেকে জানা গিয়েছে। স্টেডিয়ামের আধুনিকীকরণ হলে বাইরে থেকে খেলোয়াড়রা এখানে খেলতে আসবেন, তখনই প্রয়োজন হবে এই যুব আবাসের। ফলে এর উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় তাকিয়ে এখন গোটা কোচবিহারবাসী।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

দুধ-কচুপাতার ধোঁকার ডালনা

জুয়ার্সের ডিশ

উপকরণ- দুধ, কচুপাতা, ছোলার ডাল, তেল, নুন, চিনি, আলু, আদা বাটা, জিরে বাটা, কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো, হলুদ, ঘি, তেজপাতা, গরম মশলা, সরষের তেল।

প্রণালী- ছোলার ডাল সারারাত ভিজিয়ে বেটে নিতে হবে। তারপর সব মশলা দিয়ে ডালটা ফেটিয়ে রাখতে হবে। প্রথমে একটা কচুপাতার উপরে ডাল বাটা দিয়ে দিতে হবে, তার ওপর আবার কচুপাতা, আবার ডাল বাটা— এইভাবে চারটে স্তর করতে হবে। এবারে পাতাটা মুড়ে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলতে হবে। একটা পাত্রে জল ফোটাতে হবে। সেই ফুটন্ত জলে এই পাতা দিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ এই ডাল বাটা শক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ ফোটাতে হবে। তারপর জল ফেলে দিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। এবারে সুতো কেটে ফেলে ডাল বাটার বাইরের কচুপাতা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। তারপর সেটাকে ডুমো ডুমো করে কেটে তেলের মধ্যে লাল করে ভাজতে হবে।

কড়াইতে তেল দিয়ে তার মধ্যে জিরে, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিতে হবে। আগের থেকে আলু ডুমো ডুমো করে কেটে ভেজে রাখতে হবে। এবারে জিরে বাটা, আদা বাটা, হলুদ, লংকার গুঁড়ো, নুন, চিনি— সব দিয়ে ভাল করে কষতে হবে। মশলা ভাজা হয়ে গেলে অন্য একটি পাত্রে যে পরিমাণ জল লাগবে, সেটা ফুটিয়ে নিতে হবে। ঠান্ডা জল ঢালা যাবে না। এইবার মশলার মধ্যে জল দিয়ে ধোঁকা ও আলু দিয়ে দিতে হবে। ঝোল মাখা মাখা হলে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে নামাতে হবে। ইচ্ছে করলে এই ডিশটি পেঁয়াজ-রশুন দিয়েও করা যেতে পারে। ধোঁকাগুলি ভাজাও খেতে পারেন।

রত্না গোস্বামী, কোচবিহার

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

১৯৭২-এ বিপুল আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসার মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে কেন রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হল কংগ্রেস? কী ছিল বামপন্থীদের ভূমিকা? এ নিয়ে বহুকাল ধরে প্রচারিত ঘটনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে লেখকের বিশ্লেষণ তুলে ধরছে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি। কেন কংগ্রেসি রাজনীতিতে বহু সমালোচিত ‘পরিবারতন্ত্র’র অনুপ্রবেশ ঘটল, সে কথাও উঠে এসেছে এবারের পর্বে। রাজ্য কংগ্রেসে ‘বামপন্থী’ গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ, সঞ্জয় গান্ধির উত্থানের প্রাসঙ্গিকতা, বহু উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সত্ত্বেও সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পরাজয়ের নেপথ্য কারণ হিসেবে এই কিস্তিতে আলোচিত হয়েছে এমন কিছু দিক, যা এতদিন সেভাবে আলোচিত কিংবা বিশ্লেষিত হয়নি। সব মিলিয়ে আকর্ষণীয় তো বটেই, ভাবনারও।

১৭

প্রকৃতপক্ষে ’৭২ থেকে ’৭৭ ছিল আমাদের মতো কংগ্রেসিদের কাছে যন্ত্রণার কাল। আমরাই তখন এ রাজ্যে শাসক, আবার আমরাই শাসিত। বামপন্থীরা ওই সময়ে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সন্ত্রাস নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়েছেন, কিন্তু মানুদার আমলে বিরোধীরা নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত হয়েছেন— এমন একটা নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। বস্তুত, বামপন্থীদের নিয়ে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। ওঁরা একটা কলঙ্ক সুকৌশলে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের গায়ে ছেটাতে চেষ্টা করেছিলেন। একদিন সকালে কাশীপুর খালে দেখা গেল এগারোটা লাশ ভাসছে। এটা ১৯৭২-এর কথা। ঘটনাটা ‘কাশীপুর গণহত্যা’ নামে পরিচিত হয়েছিল। বামপন্থীরা এই হত্যাকাণ্ডের দায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাঁরা অনেকদিন ধরে বলে আসছিলেন যে, এই গণহত্যার নেপথ্য কান্ডারি মানুদা। কিন্তু চৌত্রিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষমতায় থাকার সময়ে বামপন্থীরা দত্ত কমিশন, শর্মা কমিশনের মতো অনেকগুলি কমিশন গঠন করেছেন এই গণহত্যার তদন্তের জন্য। কোনও কমিশনই এই হত্যার পিছনে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের অবদান খুঁজে পায়নি। বস্তুত, এই হত্যাকাণ্ড কারা সংগঠিত করেছিল, সে তথ্যও উদ্ধার করতে পারেনি কমিশনগুলি।

আসলে ’৭২-এর শোচনীয় পরাজয়ের পর বামপন্থীরা যেটা শুরু করেছিলেন তা হল গোপনে, ছদ্ম পরিচয়ে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে গুপ্তচরগিরি। ‘শিক্ষা বাঁচাও কমিটি’ ইত্যাদি কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধদের কমিটিগুলিতে তাঁরা যোগ দিতেন পরিচয় গোপন করে। ত্রিপুরার কমরেডরা তো সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে লুকিয়ে কংগ্রেসের এইসব গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন। ’৭৭-এ বাম-সরকার গঠিত হওয়ার পর তাঁরা আবার ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে স্বমহিমায় ‘কমরেড’ হয়ে যান। মনোজ চক্রবর্তী বলে একজন ’৭৭-এ লোকসভায় ডায়মন্ড হারবারে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছিল। মাস তিনেক পর যখন বিধানসভা নির্বাচন, তখন দেখলাম সে বালিগঞ্জে সিপিএম প্রার্থীর হয়ে ঝান্ডা নিয়ে বেরিয়েছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তুই কি সিপিএম-এর?’

‘আমি তো তা-ই।’ সে জবাব দিয়েছিল, ‘লুকিয়ে ছিলাম বলে কংগ্রেস করতাম।’

সুতরাং বামপন্থীদের সে সময় কোনও ‘মূল্য’ দিতে হয়নি। ওটা কংগ্রেসের একাংশই দিয়েছিল। আসলে এ প্রজন্মকে, যারা সাতের দশক দেখেনি, তাদের কাছে বামপন্থীরা ‘সত্তর-সাতাত্তরের সন্ত্রাস’ নামক ঘুমপাড়ানি গান শোনায়। বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য যেমন বলা হত, ‘ঘুমিয়ে পড়ো, নয়ত গব্বর সিং ধরে নিয়ে যাবে’— এও অনেকটা তা-ই। বামপন্থীরা নিজেদের পরাজয় মানতে না পেরে, বিধানসভা বয়কট করে আসলে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন সে সময়টা। এই পলায়নবাদী মানসিকতার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে দিনের পর দিন ‘সন্ত্রাস’-এর অজুহাত খাড়া করে এসেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, জরুরি অবস্থার সময় প্রফুল্ল সেনের মতো গান্ধিবাদী নেতারা প্রকাশ্যে পথে নেমে জয়প্রকাশ নারায়ণকে সমর্থন জানিয়েছিলেন অথচ বামপন্থীরা তখন ছদ্মবেশে কংগ্রেস করছেন। তখন কোথায় ছিল ‘বিপ্লবী সক্রিয়তা’? তাঁদের কোনও নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তখন?

’৭৭-এর সিপিএমের ফিরে আসা আসলে ছিল প্রফুল্ল সেন, খগেন দাশগুপ্তর আঁচলের ছায়ায় ফিরে আসা। জরুরি অবস্থায় অবাধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর বিধিনিষেধ যেমন নেমে এসেছিল, তেমনই

শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল বিস্ময়কর উন্নতি। ওই অবস্থা নিয়ে বহু অলোচনা-বিতর্ক হয়েছে। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে নেমে জয়প্রকাশজি দারুণ সাড়া ফেলেছিলেন। গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। তখন বামপন্থীদের তো দেখিনি কোথাও! ব্যক্তিগতভাবে আমরা যে ব্যাপারটা মানতে পারিনি তা হল, ইসিএ অর্থাৎ এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটির উত্থান। সঞ্জয় গান্ধিকে ঘিরে তিনটি চরিত্র একটি চক্র গড়ে তুলেছিল। তাঁরা ছিলেন বংশীলাল, ওম মেটা ও বিদ্যাচরণ শুক্লা। সংবাদমাধ্যম এঁদের 'ককাস' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে, এবং এঁরা সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস (এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অথরিটি) বলে চিহ্নিত হয়ে ওঠেন। আমরাও অনেকে এটা মানতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু একই সময়ে বিশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে 'গরিবি হঠাও'-এর ডাকও তো দিয়েছিলেন ইন্দিরাজি।

অন্য দিকে, জরুরি অবস্থাকে তো সিপিআই সমর্থন করেছিল!

এ প্রসঙ্গে বলি যে, '৭২ সালের নির্বাচনে আমরা নাগরাকাটা বিধানসভার আসনটি সিপিআইকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রার্থী ছিলেন প্রেম ওঁরাও। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, গোপাল ব্যানার্জিরা এসেছেন সিপিআই-এর হয়ে প্রচারে। সেখানে কংগ্রেস থেকেও যেতে হবে। জেলা থেকে আমাকে আর রাতুলদাকে পাঠানো হল দলের হয়ে প্রচারের জন্য। নাগরাকাটার সিপিআই অফিসে বসে আছি। এমন সময় গোপাল ব্যানার্জি বলে উঠলেন, 'কই? কংগ্রেস থেকে তো কেউ এল না।'

বললাম, 'আমাদের দু'জনকে পাঠানো হয়েছে।'

গোপাল ব্যানার্জি তা-ই শুনে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে যে কথাটা একটু হেসে বলেছিলেন তা আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'দেখলেন ইন্দ্রজিৎদা! ওরাই আসলে প্রগতিশীল। কত কম বয়সের ছেলেকে সামনে তুলে নিয়ে এসেছে। এদিকে আমরা তো আর জায়গাই ছাড়লাম না।' সিপিআই '৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনেও আমাদের সঙ্গে ছিল এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকে তারা বলেছিল 'ফ্যাসিবাদী'।

যদিও '৭২ থেকে '৭৭ জোটধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে মানুদা মোটেও উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন না, এবং '৭৫-এর শুরুতেই ২০ দফা কর্মসূচির সমন্বয় কমিটির মিটিং ও কোনও একটা বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়াতে সিপিআই নেতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে মানুদা এক ঘর লোকের ভিতর যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করলেন। পরিণতিতে উনি এবং গোপালবাবু (গোপাল ব্যানার্জি) আর কখনও ওই সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত হননি। একবার আমি পুরুলিয়া থেকে রাতের গাড়িতে কলকাতা ফিরছি, দেখি ওই কুপেতে বিশ্বনাথবাবুও আছেন। সঞ্জয় গান্ধির প্রবল সমালোচনা করে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন তিনি, বলেছিলেন, 'মিঠু, যেখানেই থাকো, মাকে ছুঁয়ে থেকো।' মানেটা জানতে চাইলে বললেন, 'হারকিউলিসের সমসাময়িক আর-একজন অপরাজেয় যোদ্ধা ছিল অ্যানটিয়াস। তার মা ছিল 'বসুন্ধরা'। মা বলেছিল, যখনই লড়বি, আমাকে ছুঁয়ে থাকবি। কেউ তোকে হারাতে পারবে না। হারকিউলিস জানত অ্যানটিয়াসের শক্তির উৎস কী। তাই প্রথমেই লড়াইয়ের ময়দানে অ্যানটিয়াসকে হারকিউলিস মাটি থেকে শূন্য তুলে নেয়। অ্যানটিয়াস তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আর হারকিউলিস সহজেই তাকে হত্যা করে।' গল্পটা বলে বিশ্বনাথবাবু বলেছিলেন, রাজনীতির লোকদের কাছে জনগণই হল মা। তাকে ছুঁয়ে থাকলে কখনও পরাজিত হতে হয় না।

এসব বলার কারণ হল যে, '৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ আদৌ জরুরি অবস্থা কিংবা সিদ্ধার্থশংকর রায়ের 'সন্ত্রাস' ছিল না। কংগ্রেস হেরেছিল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার কারণে। পাঁচ বছরের শাসনকালে সিদ্ধার্থশংকর রায় অনেকগুলি ভাল কাজ করেছিলেন, কিন্তু জনবিচ্ছিন্ন থাকার কারণে সে কাজের প্রচার কংগ্রেসের পক্ষে যায়নি। বরং মিশা ইত্যাদির ফলে কংগ্রেসিরাই গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে লোকের মনে এই ধারণা গেঁথে গিয়েছিল যে, দলটা দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। সাতাত্তরের সন্ত্রাস কথাটা শুনতে ভাল। কিন্তু ব্যাপারটা বামপন্থী, বিশেষ করে সিপিএম-এর ওই টালমাটাল সময়ে রাজনীতি না করে লুকিয়ে থাকার সাফাইমাত্র। আগেই বলেছি যে, সে সময়ের ইতিহাসনিরপেক্ষভাবে রচিত হলে বহু কিংবদন্তি মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমরা যে ২১৮ থেকে ২০-তে নেমে এলাম, তার কারণ গভীরভাবে কেউ বিশ্লেষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, আমরা আরও একটা বড় সংকটের শিকার হয়েছিলাম। ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, ১:৩ ফসলের ভাগ প্রভৃতি কর্মসূচি যাদের পায়ের নিচে মাটি পৌঁছে দিয়েছিল, তারা কিন্তু কংগ্রেসের ঝান্ডার নিচে এল না। কারণ তাদের হাতে আগের থেকেই লাল ঝান্ডা ছিল। আর যারা জমি হারাল, বর্গা নিতে বাধ্য হল, সেই জোতদার শ্রেণি চিরাচরিতভাবে কংগ্রেসের ঝান্ডা বহন করার পরও যখন দেখল কংগ্রেস তাদের দেখছে না, তারা তখন জনতা পার্টির ঝান্ডার নিচে ভিড় করতে শুরু করল। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে যারা উপকৃত ছিল, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তারা দল ছাড়ল। আর অর্থনৈতিকভাবে যারা উপকৃত হল, তারা রাজনৈতিকভাবে অবস্থান পরিবর্তন না করে বাম-রাজনীতির সঙ্গেই থেকে গেল। ফলশ্রুতিতে ২১৮ থেকে ২০-তে নেমে এলাম।

এবার সে সময়ের জাতীয় রাজনীতি নিয়ে আমার ধারণা একটু বলি।

মনে রাখতে হবে যে, '৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময়ে কংগ্রেস কিন্তু ইন্দিরাজির পাশে ছিল না। এই কারণে কংগ্রেস ভাগ হয়ে যায়। এর পর ইন্দিরাজিকে '৭১ সালে সংখ্যালঘু সরকার চালাতে হয়েছিল, এবং তিনিই কংগ্রেসকে আবার প্রাসঙ্গিক করে তুলতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক গবেষক দেখিয়েছেন যে, সে সময়ে কংগ্রেস যদি ইন্দিরাজির পরিবার হয়ে উঠতে পারত, তবে তিনি কখনওই পরিবারতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে যেতেন না। সঞ্জয় গান্ধিরও কোনও প্রয়োজন হত না কংগ্রেসে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপ ইত্যাদি সংস্কার ভারতের তৎকালীন অর্থনীতির বড় অংশে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। কারণ তখন দেশের অর্থনীতির ৮২ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করত কৃষি। ১৯৭৪-এ তিনি হুইট ট্রেড অধিগ্রহণ করলেন। বস্তুত, সে সময়টায় ইন্দিরাজি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং দেশের বেশ কিছু সমাজতান্ত্রিক নেতার সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্কও ছিল। এঁদের কেউ কেউ বামপন্থীও ছিলেন। ইন্দিরাজি ভেবেছিলেন যে, অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির বিপণনের দায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকুক। কিন্তু এই পরিকল্পনা কৃষির সঙ্গে জড়িত প্রতিপত্তিশালী শ্রেণিকে খেপিয়ে তুলেছিল। উত্তর ভারতের কৃষিতে যাঁরা শেষ কথা ছিলেন, সেই 'কুলাক'রা তাঁর বিরোধিতা শুরু করল। এদের নেতা চৌধুরী চরণ সিং একবার দেশের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন, তা মনে রাখতে হবে। এই তীব্র বিরোধিতার ফলশ্রুতিতে ইন্দিরাজির রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পিছু হঠা। তিনি গমের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্থানও এই সময়ে।

সঞ্জয় গান্ধি সে সময় পাঁচ দফা কর্মসূচির যে নীতিগুলি ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল 'হম দো হমারে দো', 'ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান', 'প্ল্যান্ট আ ট্রি'— এসব নীতির বাস্তবতা এখন আরও বেশি অনুভূত হয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে এই নীতিগুলি ঘোষণায় উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, তাঁরা সে

নীতিগুলিকে ফলপ্রসূ করায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাননি। ইন্দিরাজির বিশ দফা কর্মসূচির ফলে গরিবের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা আসবে— এটা যাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না, তাঁরাই সঞ্জয় গান্ধিকে পালটা পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণার ইন্ধন জুগিয়েছিলেন, যাতে দল, বিশেষ করে যুব কংগ্রেস, বিশ দফা অভিমুখী না হয়ে অরাজনৈতিক সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণের ভিতরই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখে। একদিকে বিশ দফা রূপায়ণে দলের অনীহা, অন্য দিকে কৃষিতে হস্তক্ষেপের কারণে ইন্দিরা-বিরোধিতার হাওয়া। জয়প্রকাশ নারায়ণরা সেই হাওয়া প্রবল করে তুলতে সফল হয়েছিলেন।

’৭৭-এ লোকসভা নির্বাচন করার কোনও বাধ্যবাধকতা কিন্তু ইন্দিরাজির ছিল না। তখনও সরকারের মেয়াদ ফুরাতে এক বছর বাকি ছিল। সময়মতো নির্বাচন করলে তিনি পরাজিত হতেন কি না সন্দেহ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই পরে দেখেছিলেন যে, ভোট এগিয়ে আনলে হেরে যাবেন জেনেই ইন্দিরাজি ’৭৭-এ লোকসভা নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মনে হচ্ছিল যে, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কোথাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

লোকসভা অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেস পেল ১৫৭টা আসন। এ রাজ্যে ভোটের আগের দিন অবধি শুধুই কংগ্রেস। ভোটের দিন দেখা গেল, কংগ্রেস ছাড়া সবাই আছে। নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটল। রাজ্যে আমরা পেলাম তিনটে আসন। রাজ্যে নিজেদের সরকার থাকা সত্ত্বেও তার সুফল আমি পাইনি। তবুও সান্ত্বনা ছিল যে কেন্দ্রে আমাদেরই সরকার আছে। এবার সেটাও গেল। আমার মা-বাবা দু’জনই তখন জীবিত।

তবুও দুঃখে আমি নেড়া হলাম।

(ক্রমশ)

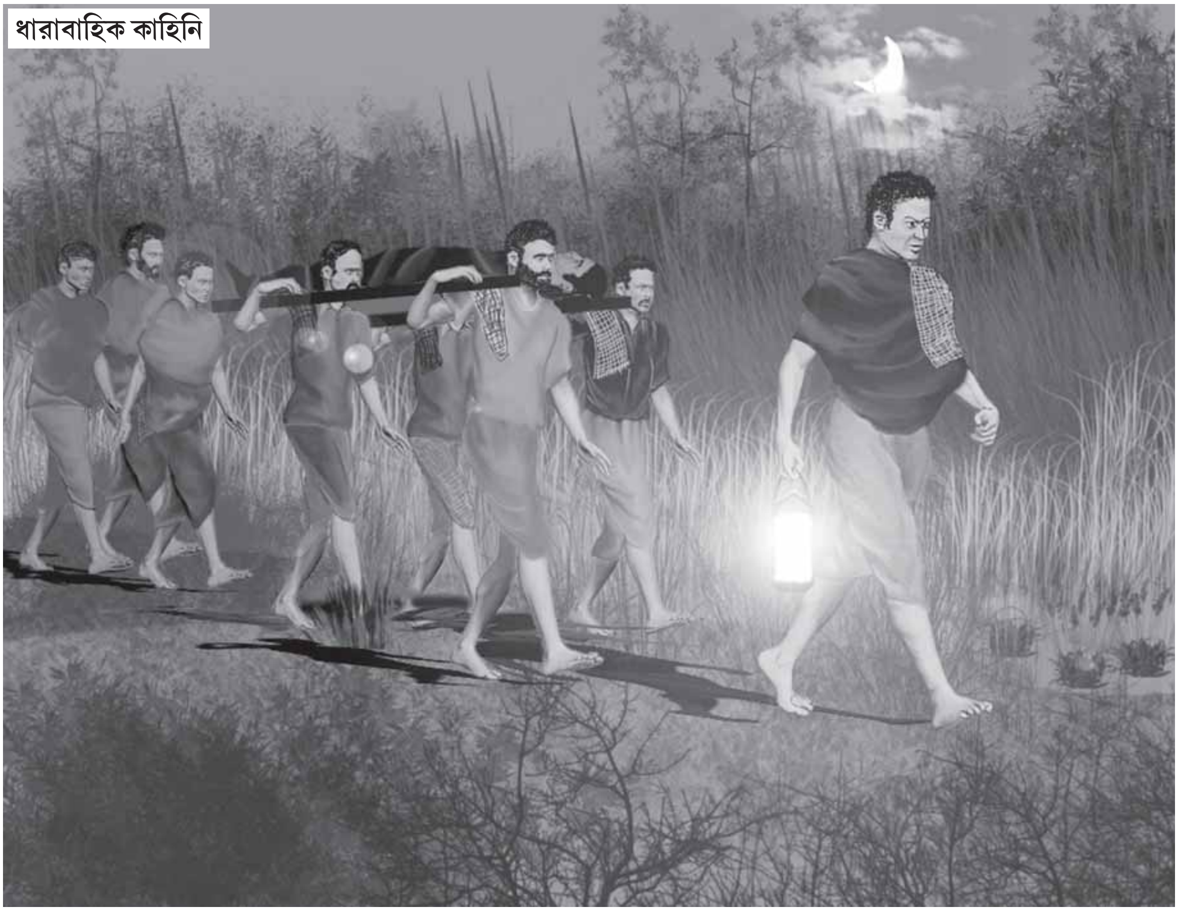

তরাই উৎরাই

রাসপূর্ণিমার পরের পূর্ণিমার দু'দিন আগে হিদারুর মেজদা উকিলের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি ভাগাভাগির বিষয়ে জোর আলোচনা করে বাড়িতে এসে ঘামতে শুরু করলেন। তাঁকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল তিনি নেতিয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ পর টের পাওয়া গেল, তাঁর কোনও সাড়া নেই। তখন রাত আটটা মতো বেজেছে। অবনী ডাক্তারকে নিয়ে হিদারু ফিরে এল ঠিক চল্লিশ মিনিটের মাথায়। তিনি পনেরো মিনিট মেজদাকে পরীক্ষা করার পর কদমছাঁট দেওয়া মাথাটা যে ভঙ্গিতে নাড়ালেন, তার একটাই অর্থ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা বাড়িটা ভেঙে পড়ল তুমুল কান্নায়। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, চারপাশের লোকজনদের অনেকেই ছুটে এসেছে হিদারুর বাড়িতে। তাদের পেল্লায় উঠোন জুড়ে প্রায় মেলা বসে গিয়েছে। শুধু হট্টগোলটা নেই। তীব্র কান্নার ধ্বনিতে ভেসে যেতে যেতে জমায়েত হওয়া লোকজন নিচু স্বরে জরুরি আলোচনা সেরে নিচ্ছিলেন তখন। সেই আলোচনার মূল বিষয় হল শ্মশানযাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করা। টাউনে অবশ্য এটা কোনও ঘটনাই নয়। লোকজন কেবল একজনের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। টাউনে কেউ মারা গেলে 'মোদ্দা' ওরফে মধুবাবু কী করে জানি সংবাদ পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে লোকজন নিয়ে চলে আসেন। শবদাহের ব্যাপারে তাঁর অসীম আগ্রহ। জীবনে কত মড়া যে পুড়িয়েছেন, তার লেখাজোখা নেই। টাউনের মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর বছরে একটা মড়া শ্মশানে ফ্রি-তে পোড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। এই শহরের মানী লোকেরা তাঁকে আদর করে ডাকেন 'মুদ্দাফরাশ' বলে।

লোকজনের অপেক্ষা ঘুচিয়ে দশটা বাজার একটু আগেই দেখা গেল দলবল নিয়ে মধুবাবু চলে এলেন। টকটকে গৌরবর্ণের মানুষ। লম্বা এবং বলিষ্ঠ চেহারা।

ধুতির উপর হালকা সুতির চাদর চাপিয়ে হিদারুর বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকতেই লোকজন সমীহের সঙ্গে তাঁকে ভিতরে যাওয়ার পথ করে দিল। মধুবাবু অবশ্য ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না। চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে কাছাকাছি থাকা রমেশ হালদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বাড়ির ছোট ছেলেটার নাম হিদারু না? সে কোথায়?'

হিদারু অদূরে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। রমেশ হালদার ইশারায় তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। মধুবাবু হিদারুর কাছে এসে স্নেহের সুরে বললেন, 'কী হয়েছিল বাবা?'

হিদারু সজল চোখে তাকাল। অস্ফুটে বলল, 'সন্ন্যাসরোগ। কোনও সুযোগই পেলাম না।'

'এর নামই জীবন! এই আছে। এই নেই।' মধুবাবু নরম গলায় বললেন, 'যা হয়েছে, মেনে নিতে হবে বাবা! যে যায়, সে তো যায়। যারা থাকে, তাদের অনেক দায়িত্ব বর্তায়। বাড়ির শোক একটু কমলে দেহটাকে বার করে দিয়ো। হরিনাথ সান্যালের ছোট ছেলেটা দেড় দিনের জ্বরে সকালে মরেছে। মাত্র বারো বছর বয়স।'

মধুবাবু চুপ করলেন। হিদারুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার পর চোখ মুছে হিদারু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি দেখছি দাদা!'

'শুধু মেয়েদের সরিয়ে দাও। বাকি কাজ আমরাই করে নিচ্ছি।'

কথাটা শেষ করেই তিনি পিছন দিকে তাকিয়ে গমগমে গলায় হাঁক দিয়ে বললেন, 'এই, আয়োজন শুরু কর! বাড়ির পিছনে দেখ বাঁশঝাড় আছে।'

কেউ একটা মোড়া জোগাড় করে ইতিমধ্যে উঠোনে এসে রেখেছে। সেটায় বসে মধুবাবু সৎকারকার্যের তদারকি শুরু করলেন। শেষে প্রায় জনা বিশেক ছেলেছোকরা এবং হিদারুর বাড়ির পুরুষদের নিয়ে তিরিশ-বত্রিশজনের দলটা যখন শ্মশানের উদ্দেশে রওনা দিল, তখন বারোটা বাজেনি। সমস্ত কাজ শেষ করে হিদারু যখন বাড়িতে ফিরে স্নান সেরে নিজের ঘরে ঢুকল, তখন ভোর হয় হয়। অধিকারী এসে নিয়মকানুনের ফিরিস্তি শোনচ্ছিলেন বড়দাকে। পারলৌকিক কর্ম দেশীয় মতে হবে, না ক্ষত্রিয় মতে হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা গেল অচিরেই। ধর্ম আর সংস্কার চিরকালের বালাই। ফলে শোকের অভিঘাত কাটিয়ে হিদারুর অবশিষ্ট দাদারা অধিকারীকে ঘিরে সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মেজদার ছেলেমেয়েরা কেবল অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল সেই বৈঠকের দিকে। বড় ছেলেটার বয়স চোদ্দো পেরিয়েছে সবে। হিদারু দেখল দক্ষিণের পেয়ারা গাছটার দিকে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সেই শূন্য এবং অসহায় দৃষ্টি সহ্য হল না হিদারুর। তার মনে পড়ল যে, পেয়ারা গাছটা মেজদাই লাগিয়েছিল একদিন হইহই করে।

প্রায় চোরের মতো সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে এসে হিদারু যেন স্বস্তি পেল। বাপের রেখে যাওয়া বিষয়সম্পত্তির মধ্যে দুটো পুকুর নিয়ে জটিলতা কাটছিল না। পুকুরকে তো জমির মতো ভাগ করা যায় না। এ নিয়ে দাদাদের মধ্যে রোজই অশান্তি এবং উকিলের বাড়ি দৌড়ানো চলছিল কয়েকদিন ধরে। কী লাভ হল এতে? একজন দাবিদার চলে গেল শুধু। এখন যেভাবে দাদারা অধিকারীর সঙ্গে বসে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, নিচু গলায় শান্ত স্বরে কথা বলছে, সেভাবেই যদি নিজেরা বসে মিটিয়ে নিতে পারত পুকুরের ভাগ, তবে মেজদার বড় ছেলেটা আজ অমন চোখে তাকিয়ে থাকত না।

হিদারু বাইরে এসে আকাশের দিকে মুখ করে প্রথম উপচে ওঠা কান্নাটাকে দমন করল। গলা আর মাথা ব্যথা করতে লাগল তার। কষ্ট কমানোর জন্য হাঁটতে শুরু করল সে উদ্দেশ্যহীনভাবে। তার নিজের সন্তানরা রয়েছে। তবুও হাঁটতে হাঁটতে তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল মৃত দাদার বড় ছেলের হতভম্ব, অসহায়, শূন্য দৃষ্টি মাখানো চোখ দুটো।

হাঁটতে হাঁটতে তিস্তা নদীর পাড়। পাড় বেয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে আয়রন হাউজের পিছন দিকটায় এসে পড়ল হিদারু। গাছপালার ফাঁক দিয়ে উলটো দিকে পিডব্লিউডি আপিসের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সে বাড়ির দক্ষিণে করলার পাড় বরাবর বেশ বড় একটা জলা। বেশ কিছু হাঁস সাঁতার কাটছিল এই জলে। হিদারু ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল জলার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে। এই পথটা কাছারির দিকে চলে গিয়েছে। বড় অফিসারদের অফিস আর বাংলো এই পথেই। তারপর করলা নদী ফুরিয়ে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে তিস্তায়। ওপারে কিং সাহেবের ঘাট। নদীর ওপারে রবার গাছের জঙ্গল।

করলার পুল পেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছিল এদিকে। গাড়ির আরোহী হিদারুকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'হিদারু! এই যে! এদিকে!'

আচমকা নিজের নাম শুনতে পেয়ে হিদারু গাড়িটার দিকে দৃষ্টি দিল। বুঝতে পারল গলাটা খুদিদার। ঘোড়ার গাড়ি চেপে তিনি হিদারুর দিকেই এগিয়ে আসছেন। কোচোয়ান লাগাম টেনে গাড়িটা থামিয়ে দিল হিদারুর ফুটকয়েক আগে।

'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।' খুদিদা গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'আমি রাতেই খবর পেয়েছি। তা তুমি এখানে কী করছ?'

হিদারু কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'মন খারাপ লাগছে? স্বাভাবিক! হাজার হলেও নিজেরই তো দাদা! কিন্তু এই সময় তোমার বাড়িতে থাকাটাই দরকার বাবা! তোমার স্ত্রী-সন্তানরা তো আছে। তাদের দিকটা দেখবে না? চলো, গাড়িতে ওঠো।'

'ওই বাড়ি আর আমার ভালো লাগছে না দাদা! দাদার কাজ মিটলেই আমি বাড়ি ছেড়ে দেব!'

'আরে সে তো পরের কথা! আর নিজের বাড়ি ছাড়তেই বা যাবে কেন?'

'ওখানে অভিশাপ লেগেছে। আমি মাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাব।'

খুদিদা চুপ করে রইলেন। ছোট শহর। তিনি উকিল মানুষ। হিদারুর বাবার বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ছেলেদের মধ্যে অশান্তির সংবাদ তিনি জানেন। এটাও জানেন যে, কেবল হিদারুই এই অশান্তির বাইরে। তার মধ্যে যে একটা সংবেদনশীল মনের অস্তিত্ব আছে, সেটাও খুদিদার অনুমানের বাইরে ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মেজদার অকস্মাৎ মৃত্যু আর সম্পত্তি বিষয়ক অশান্তির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি হিদারুর। কিন্তু এটাই পৃথিবী। তুচ্ছ সম্পত্তি নিয়ে বহু বিচিত্র অপরাধ এবং অশান্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি কর্মজীবনে। সেই চূড়ান্ত বস্তুময় জগতে হিদারুর মতো ছেলেরা অনিচ্ছাতেও জড়িয়ে যায়।

'চলো। ঘরে চলো।' নীরবতা কাটিয়ে একসময় খুদিদা সস্নেহে আদেশ করলেন। দেখা গেল, হিদারু আর দ্বিমত করল না। তাঁকে নিয়ে চলতে চলতে খুদিদার মনে হচ্ছিল আলিপুরদুয়ারের কথা। গোপাল ঘোষের পৌঁছানোর তারবার্তা এসে গিয়েছে। আগামীকালই সেই প্রতীক্ষিত পূর্ণিমা। উপেনকে কি খুঁজে পাবে গোপাল?

হয়ত কাকতালীয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই হিদারু হঠাৎ স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, 'কাল তো পূর্ণিমা তা-ই না? উপেন কি আসবে?

'তোমার মনে আছে?'

'উপেনকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'তাহলে হয়ত আসবে সে।' কোনও এক অজ্ঞাত ভরসায় ভর করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন খুদিদা।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ঘুম ভাঙে সাইরেনে

চা-বাগানে জন্মেছিলাম। অদ্ভুত রহস্যময় এক শৈশব কেটেছিল চা-বাগানে। সকাল সাড়ে ছ'টায় সাইরেনের শব্দে ঘুম ভাঙত। সাইরেন চা শ্রমিকদের বাগিচার কাছে যাওয়ার সংকেত পাঠায়। শীতকালে ওই সকালে 'কে হায় লেপের ওম ছাড়তে চায়।' বর্ষায় ঝমঝম বৃষ্টির সকালে চারদিক যখন অন্ধকার করে আসত, তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকা। টিনের চালে বৃষ্টির একটানা শব্দের জাদুতে আবিষ্ট হয়ে পড়তাম। মা পড়তে বসানোর চেষ্টা চালিয়ে যেত। এসব বেতগুড়ি চা-বাগানের কথা। কিন্তু সাইরেন ঠিক সময়ে বাজবেই।

আমাদের চা-বাগানে তখন ঘণ্টা পেটানো হত প্রতি ঘণ্টায়। অনেক দূর থেকে ঘণ্টা বা সাইরেনের আওয়াজ শোনা যেত। সে সময়ে ব্রিটিশ ম্যানেজাররা খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল। তাদের সময়জ্ঞান ছিল তারিফ করার মতো। সাইরেন বা ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে সময় মেনে চলার নির্দেশ দিত। নিজেরা সাতসকালেই ঘোড়ায় চেপে চা-বাগানে হাজির। কাজকম্মের তদারকি চালাত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বারো মাস প্রায় অপরিবর্তিত রুটিন।

ঘণ্টা ধরে বাবুরা সবাই টিফিন ও দুপুরের আহার সারত। সময়মতো কর্মস্থলে ফিরেও যেত। ওই সময় আমাদের দুষ্টুমির বিরতি। বাবারা সবাই মোটামুটি রাশভারী। কোনও কোনও চা-বাগানে ছুটির সময় দ্বিতীয়বার সাইরেন বাজত।

হঠাৎ করে অসময়ে সাইরেন বাজলে বুঝতে হবে গুরুতর বিপদ হয়েছে, সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। তা ছাড়া বিপদের সময় ঘণ্টাও একটানা ঢংঢং শব্দে বেজেই চলত। একটানা ঘণ্টাকে বলা হত 'পাগলা ঘণ্টি'। একবার চা-বাগানের পেট্রোলের গুদামে আগুন লেগেছিল। বীভৎস আগুন— প্রচণ্ড শব্দে পেট্রোলের ড্রামগুলোয় বিস্ফোরণ হচ্ছিল। আমাদের বাসা থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে। সরাসরি দেখা যাচ্ছিল। এদিকে আমার দিদিরা ভয়ে কান্না জুড়ে দিল। কেন জানি না ওরা কিছু জামাকাপড় দিয়ে একটা পোঁটলা বানাল। সে দিন একটানা পাগলা ঘণ্টি বেজেছিল। অনেক দূর থেকে ঘণ্টা শুনে এবং আগুনের বিধ্বংসী শিখা দেখে মানুষরা ভিড় করে এসেছিল। কাছে যায় এমন সাধ্য ছিল না। সে সময় মালবাজারে দমকল কেন্দ্র ছিল না। সবটুকু জ্বালানি পুড়ে যাওয়ার পর আগুন নিবেছিল।

পরবর্তীকালে যখন সাওগা চা-বাগানে বাবা এলেন, তখন শুধু ঘণ্টা ছিল। পরে সাইরেন আসে। সাওগা বিমানঘাঁটিতে ছয়ের দশকের শুরুতে সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন। 'কাপুরুষ মহাপুরুষ' ছবির কিছু দৃশ্য তিনি ডুয়ার্সে ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। ওই দিন সাইরেন শুনে বাবাকে কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর শুনে বলেছিলেন, চটকলেও এমন সাইরেন বাজে। সাওগাতে তিনি শুটিং করেননি। জায়গা দেখতে এসেছিলেন।

পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি শহরে এলাম, শৈশব পেরিয়ে। এখানে জেলখানা থেকে চোর-ডাকাত পালালে সাইরেন বাজত। আমার বেশ ভয় করত। যদি সে আমাদের বাড়িতে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে! আর ভাবতাম ওদের সাহসের কথা— কীভাবে ওই উঁচু প্রাচীর টপকাত? একত্রিশে জানুয়ারি সকালে মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ স্মরণে সাইরেন বাজে। নীরবতা পালনের জন্য।

১৯৬২ সালে চিনের যুদ্ধের সময় রাতে আলো ঢেকে রাখা হত। আর বিমান হামলার আগে সাইরেন বাজবে বলে একটা গল্প চালু ছিল। রেডিয়োতে সবাই খবর শুনত। বমডিলা নামে একটা জায়গায় চিনারা ঢুকে পড়েছিল। আমার কেবল মনে হত, যে কোনও মুহূর্তে সাইরেন বাজবে আর চিনারা আকাশ থেকে বোম ফেলবে। তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে সারাটা ডুয়ার্স জুড়ে প্রচুর সেনা ছাউনি তৈরি হয়েছিল।

কিছুদিন বাদে জলপাইগুড়ি শহরের কিছু জায়গায় সাইরেন বসল। সকাল ন'টায় নিয়মিত সাইরেন বাজত। সময়টা ন'টা কেন তা আজও বুঝিনি। তবে আমার সুবিধা হয়েছিল। আমার মাস্টারমশাই সাইরেন বাজলেই ছুটি দিতেন। আমিও সোজা ডাংগুলি খেলার পরিসরে।

১৯৬৮-র বন্যায় জলপাইগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন অঞ্চল, চা-বাগান, বনাঞ্চল প্রায় ধ্বংস হতে চলেছিল। বর্ষায় মানুষ আতঙ্কে থাকত। সেচ দপ্তর ও জেলাশাসকের অফিসে কন্ট্রোল রুম খোলা হত। সতর্কবার্তা জারি করা হত। সাতের দশকে একদিন তিস্তা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল। লাল সংকেত জারি করা হয়েছিল। শহরে সাইরেন বেজে উঠেছিল। শহরের মানুষ পুরনো স্মৃতি মনে করে খুব আতঙ্কিত হয়েছিল।

ডিএম অফিস, কাঁঠালগুড়ি বিল্ডিং, গোপালপুর হাউজ ইত্যাদি জায়গাতে সাইরেনগুলো বসানো হয়েছিল। ন'টায় সাইরেন বেজে উঠলেই অফিস কর্মী, ছাত্রছাত্রীদের তৎপরতা শুরু হত। কর্মস্থলে বা স্কুল-কলেজে যেতে হবে।

একসময় ন'টার সাইরেন শহরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তারপর মাঝে মাঝে সাইরেন বাজত না। অসুবিধা হচ্ছিল। ধীরে ধীরে একদিন তা সয়ে গেল। এখন আর সাইরেনের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শুনতে পাই না অথবা শোনার অভ্যাসটাই হারিয়ে ফেলেছি। এমন অনেক কিছুই নগরজীবন থেকে তিলে তিলে মুছে গিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। এটাই নিয়ম। নইলে শুনতে হবে, আপনি পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন না।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

লাল চন্দন নীল ছবি

কেউ বলছে, দুর্দান্ত, বাঃ। কেউ বলছে, লুকিয়ে পড়তে হয়, ছি! 'লাল চন্দন নীল ছবি'কে ঘিরে পাঠক মহলে স্পষ্টতই তর্ক জমে উঠেছে জোরদার। ফোনে ও মেলে নিয়মিত মতামত পাই প্রিয় পাঠকদের। এবার মনে হল, তার খানিকটা সবার সঙ্গে শেয়ার করে নেওয়া যাক।

বন্ধ করুন

সম্পাদক, এখন ডুয়ার্স
দয়া করে আপনাদের এই ম্যাগাজিনে 'লাল চন্দন নীল ছবি' পর্ন ধারাবাহিকটি বন্ধ করুন— এটা পারিবারিক পত্রিকা।

—**প্রবুদ্ধশংকর রায়চৌধুরী**, সেন্ট্রাল পার্ক, যাদবপুর, কলকাতা-৩২

লেখকের উত্তর—

প্রবুদ্ধবাবু অভিযোগ করেছেন যে, 'লাল চন্দন নীল ছবি' একটি পর্নোগ্রাফি। পারিবারিক পত্রিকায় তাই এর প্রকাশ বন্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাটিতে কোথাও যৌনমিলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে কি? অথবা কোনও সংগমের বিস্তৃত বিবরণ? ডুয়ার্সের অন্ধকার দিকগুলির অন্যতম একটি হল দেহব্যবসা। এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি চরিত্র এই ধারাবাহিকে অন্যতম পাত্রপাত্রী। এদের সংলাপে তাদের ভাবনা ও মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে। এরা রোমান্টিক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলে ব্যাপারটা 'নাটকীয় ন্যাকামি' হত বলে আমার বিশ্বাস। অন্ধকার জগতের ভাষা কীভাবে মার্জিত-সভ্য-বিনীত-আলংকারিক-কাব্যময় হয়, তা আমার জানা নেই। এই জগতের চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথা বলে, যেভাবে অনুভব করে, তা ধরার চেষ্টা করেছি। মনে রাখতে হবে যে, দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং উক্ত ব্যবসার যারা ক্রেতা, তাদের স্বরূপ অনেকটা এইরকমই। এদের ভাষা, ভাবনা তথাকথিত 'শিষ্ট' সমাজে অস্বস্তিকর ঠেকতে পারে, কিন্তু ওই অস্বস্তিটাই বাস্তব।

দৈনিক সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেলে যৌনতা বিক্রির বিজ্ঞাপন, লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র, উত্তেজক তেলের মূল্য, এসকর্ট সার্ভিসের বিজ্ঞাপন তো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব চ্যানেল এবং পত্রিকা পরিবারের সবাই প্রত্যক্ষ করে। অলিম্পিকে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদের বান্ধবীর অতি স্বল্পবেশী, উত্তেজক রঙিন ছবি ছাপা হচ্ছে খেলার পাতায়, আসন্ন পুজোয় পুরুষকে কোন পোশাকে মোহিত করবেন তা সাড়ম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে; নায়িকাদের 'সাহসী' ফোটোসেশন দেখা যাচ্ছে দৈনিকের ক্রোড়পত্রে। আমার মনে হয় না যে 'লাল চন্দন নীল ছবি' এসবের তুলনায় 'অশ্লীল'। সভ্য-শিষ্ট জগতের প্রতিচ্ছবি যদি এত উত্তেজক হয়, প্রায় বস্ত্রহীন নায়িকার উত্তেজক নৃত্য যদি চ্যানেলে চ্যানেলে ঝমঝম করে, এবং সেই নায়িকাদের চোখে দেখার জন্য যদি সভ্য, ভদ্র নারী-পুরুষ হামলে পড়েন, তবে আমার লেখার এইসব চরিত্র, যারা নীল ছবি বানায়, মেয়ে পাচার করে, শরীর বিক্রি করে— তারা কী ধরনের 'অশ্লীল' হতে পারে বলুন তো? আমার তো মন হয়, আমি কমই লিখছি।

প্রবুদ্ধবাবু সম্ভবত পর্নোগ্রাফি পড়েননি। পড়লে এই অধমের তুচ্ছ 'মেগাসিরিয়াল'কে কোনওমতেই 'পর্নো' বলতে পারতেন না। যদি বলতেন যে রচনাটির সাহিত্যমূল্য শূন্য, অপাঠ্য— তবে খুশি হতাম। কিন্তু 'পর্নোগ্রাফি' বললেন। যদি সত্যি তা-ই হত, তবে সম্পাদক-প্রকাশকের সঙ্গে এই অধমও এদ্দিনে জেলে যেতেন।

'এখন ডুয়ার্স' পারিবারিক পত্রিকা নয়, বরং ডুয়ার্স বিষয়ক পত্রিকা। প্রবুদ্ধবাবু যদি মনে করেন যে 'লাল চন্দন নীল ছবি'র জন্য তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন, তবে ওই পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে বাকি পত্রিকাটি ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। গুগল-এ বাংলায় 'চটি গল্প' টাইপ করে দেখুন কী নমুনা পান। একালের খোকাখুকুরা সেসব পড়ে ফেলেছে। ভিডিয়োর কথা তো ছেড়েই দিলাম। এই অবস্থায় আমার তুচ্ছ রচনাটি নেহাত দুগ্ধপোষ্য! এই কাহিনির চরিত্রদের বেশির ভাগই মহাপুরুষ নয়, এদের কাছে অপরাধ হল 'গেমস'। এদের ভাষা, এদের গতিবিধি তাই চির-অস্বস্তিকর। না চাইলে, আগেই বলেছি, পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলুন। কিন্তু 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'

বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ প্রবুদ্ধবাবুকে।

—**অরণ্য মিত্র**

অভিনন্দন অরণ্য মিত্র

'লাল চন্দন নীল ছবি'র জন্য কাগজ বিক্রি বেশি হচ্ছে কি না জানা নেই, তবে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই যাঁরা এই ধরনের লেখা ছাপা হয় বলে প্রকাশ্যে নাক সিটকান, আমি জানি তাঁরা প্রতিটি সংখ্যা ঠিক সময়ে না পৌঁছালে রীতিমতো ছটফট করেন। কাগজবিক্রেতাকে কটুকথা শোনান। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অন্তত তা-ই বলে। অরণ্য মিত্র, আপনি যে-ই হোন না কেন, আপনার সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ কোনও দিন হবে কি না জানা নেই, কিন্তু দূর থেকেই আপনাকে একটা স্যালুট জানাই স্যার। ডুয়ার্সের অজানা ছবিকে এত অনুপুঙ্খ তুলে ধরার ক্ষমতা কী করে পেলেন, সেটাই আশ্চর্যের। মাঝেমধ্যে মনে হয়, আপনি ওই জগতের লোক। আবার কখনও মনে হয়, এ কোনও দুঁদে সাংবাদিকের কলম, জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বেশ নিখুঁত করে নামাচ্ছেন। এখানকার সাংবাদিক যেসব তথ্য সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করার কখনও সাহস পাবেন না, তা আপনি মেগাসিরিয়ালের ফর্ম্যাটে নামিয়ে দিচ্ছেন অনায়াসে, অকুতোভয়ে। আপনার কলমের সাবলীলতা দেখে বারবার অবাক হই! আবারও বলছি, ডুয়ার্সের প্রকৃতি ও মানুষের হালহকিকত নিয়ে যাঁদের ধারণা নেই, যাঁরা ডুয়ার্স বলতে দু'দিনের ছুটির ঠিকানা বোঝেন, তাঁরা এই মেগাসিরিয়ালের মর্ম চট করে বুঝতে পারবেন না।

অরণ্য মিত্র, আপনি কতদিন চালাবেন জানি না, তবে এইটুকু বলি, এ লেখা না প্রকাশ হলে 'এখন ডুয়ার্স' নামের সার্থকতাই থাকত না। নমস্কারান্তে—

—**সূর্যশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়**
(পূর্বতন আলিপুরদুয়ার), বর্ধমান

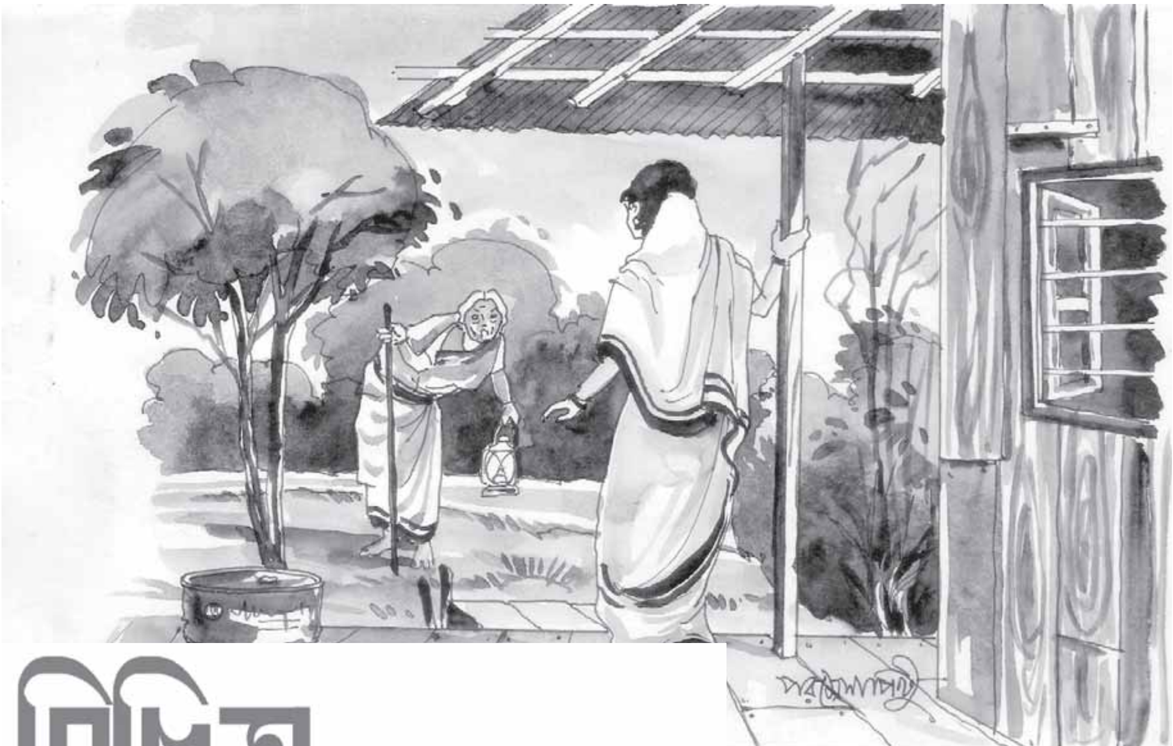

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

সে অনেকদিন আগের কথা। নীলপাড়া ফরেস্টে শিকার করতে গিয়েছেন এক শিকারি। তাঁবু ফেলে রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে। ঘুম কিন্তু আসছে না। শুয়ে শুয়ে বনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছেন। এমন সময় এক অপার্থিব সুর তাঁর কানে ভেসে এল। এক অলৌকিক সুর। যেন হাজার বছর দূর থেকে সেই সুর ভেসে আসছে। ভেসে আসছে তাঁর তাঁবুকে লক্ষ্য করে। প্রবল কৌতূহলের পাশাপাশি ভয়ও যে করছিল, তা বলাই বাহুল্য। তবু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। মনে হয়, পাখি। কত রকমের পাখিই তো থাকে। কত বিভিন্ন ধরনের সুরে তারা ডাকে। তেমনই কোনও পাখি হয়ত! এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝেই তাঁবুর দরজাটা ঝট করে খুলে গেল। আর তারপরেই তাঁবুর মধ্যে যেন আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। ভৌতিক কাণ্ড! যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার শরীর নেই। উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে আছে একটা অপার্থিব সুর। ওপারের সুর। শিকারির বুক ভয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছিল। আলো নেই। বাতাস নেই। প্রাণ নেই কোথাও। তাঁবুর ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু কিছু জোনাকি। শিকারি চিৎকার করে উঠলেন, কে? কে ওখানে? কোনও জবাব এল না। সুর ভেসে ভেসে চলে গেল অনন্তের পথে…!

ডুয়ার্সের বনজঙ্গলের সঙ্গে মিল খাইয়ে এমন অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। একজন মহিলাকে জানতাম। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে 'কাজের মাসি' হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করে তুলেছিল সে। কবে সে তরুণী থেকে মহিলায় পর্যবসিত হল, সে নিজেও মনে রাখেনি। শ্রীরামকৃষ্ণর লোক উপদেশের মতো তারও জীবন বয়ে চলেছিল। ধনীর বাড়ির কাজের মাসি, রাঁধে-বাড়ে, সব সামাল দেয়, কিন্তু মনে মনে জানে, এরা আমার কেউ নয়। বাসন্তীর জীবন ঠিক সেভাবেই চলছিল। বয়স বাড়ছে, তার সঙ্গে বাড়ছে নিরাপত্তাহীনতা। বয়সের সঙ্গে কমছে কর্মক্ষমতা। অযথা একটি মানুষকে কাজে বহাল রাখবে, এমন মানুষ কোথায়? বৃদ্ধাবস্থায় কোথায় যাবে? অনাহারে মরে যাবে। এইসব ভাবনা এসে জুটল মাথায়। একদিন সারারাত ঘুমাল না বাসন্তী। শেষ রাতে উঠে বসে রইল বারান্দায়। চোখে-মুখে ত্রাস। উশকোখুশকো চুল। বাড়ির লোকেরা সময়মতো চা না পেয়ে ক্ষুব্ধ— কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ?

না, বাসন্তী আঙুল তুলে কোণের ঘরখানা দেখাল। ওই ঘরেই বাসন্তীর শোবার ব্যবস্থা। কিন্তু এতকাল যা হয়নি, তা গতকাল হয়েছে। বাসন্তীর ঘরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। দরজা বন্ধ করলেই দম আটকে আসছে। ঘরে নানা রকমের শব্দ। কেউ জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। এমনকি, কেউ যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে হাহাকার করে উঠেছে। বুক চাপড়ে কেঁদে উঠেছে কারা সব…।

এটা ভয়। ভয় যখন মনে গেড়ে বসে, তখন ভ্রম আসে। যাকে বলে রজ্জুতে সর্পভ্রম। ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। কোনও আত্মা হয়ত কিছু বলতে চায়। কিন্তু কার আত্মা?

ধ্যাৎ, অত কে জানে? বেশি বকবক কোরো না তো। ভাল্লাগে না। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। পরলোক বলে একটা বস্তু আছে তো, নাকি? অস্বীকার করতে পারো? যদিও অস্বীকার করার মতো লোকও দুর্লভ। যে ধমক খেল, সে আরও গুটিসুটি হয়ে বসে আড়চোখে কোণের ঘরখানা দেখতে লাগল। যেন এইমাত্র ছায়া ছায়া শরীর নিয়ে বীভৎস কিছু বেরিয়ে আসবে!

বেলা শেষ হয়ে আসছে। মেঘলা আকাশ। একটা-দুটো কাক কার্নিশে বসে ঝিমাচ্ছে। ভেজা গাছপালা থেকে স্যাঁতসেঁতে, ঘোরতর বুনো গন্ধ বার হচ্ছে। শুনশান চারপাশ। কে চেঁচিয়ে উঠল, চাই…ই…ই…ই ঘটিগরম…ম…ম! পাঁচমিশালি গরম গরম ভাজা নিয়ে চলতা-ফিরতা গাড়ি চলে যাচ্ছে। ফের সব চুপচাপ। সন্ধে হল।

একটা-দুটো করে আলো জ্বলে উঠল। বোধহয় রাতে বৃষ্টি হবে। ঠিক সেই সময় নবীন মাস্টারের বউ ঘর থেকে বার হয়ে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে অন্ধকার জমে উঠেছে। বিজবিজ করছে মশা। ইলেকট্রিসিটি আসেনি এদিকে। হ্যারিকেনের আলো আর ঘরের আসবাবের ছায়া মিলে ভৌতিক ছায়াশরীর দাঁড়িয়ে আছে। কণিকার মা একদিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে— কী গো? আঁধার নামলে ঘরে থাকো না কেন? কিছু মিছু...?

মাস্টারের বউ ঘাড় নাড়ে। আছে। কিছু আছে। ঘরের ভিতরে কেউ আছে। কে? মাস্টারের আগের পক্ষের বউ সাধনা, যে স্টোভ ফেটে পুড়ে মরেছিল বিয়ের সাত মাসের মাথায়। সংসারের প্রতি লোভ যায়নি নতুন বউয়ের। ফিরে ফিরে আসে ঘরে। স্বামীর ঘরে। যে ঘর অনিচ্ছায় ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাকে!

আবার রজনী মণ্ডলের কথাও ভোলার নয়। চালসা থেকে মালবাজারে এসেছিল রোজগারের ধান্দায়। এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় পায়। শর্ত ছিল, সে বাড়ির কিছু কাজকর্ম তাকে করে দিতে হবে। বাড়ির পিছনে পড়ে থাকা আগাছাময় বাগানে এক পরিত্যক্ত কুঠুরিতে তার থাকার ব্যবস্থা হল। আপত্তি নেই। কিন্তু মুশকিল হল এক জায়গায়। সেই নির্জন কুঠুরিতে রাত হলেই খুটখাট শব্দ। টুকটাক শব্দ।

শব্দ? ওঃ! সে তো ইঁদুরের কীর্তি।

ইঁদুর? তা হবে। কিন্তু... তোতলায় রজনী। কিন্তু, তিনখানা কাশি? তিন তিনবার কে কাশল ঘরের মধ্যে? রজনী ভূত বা ইঁদুরের অস্তিত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। পরদিনই সে চলে যায়। শুনেছি, এখন নাকি হ্যামিলটনগঞ্জে আছে। সেখানকার কালী পুজোর মেলায় রজনীর হাতের কাঠের আসবাবের খুব কদর। রজনী, নবীন মাস্টারের বউ ইত্যাকার নানান রোমাঞ্চকর কাহিনি ডুয়ার্সের ভেজা বাতাসে মিশে আছে। বৃদ্ধ কালীসাধক দেবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, মৃত্যুর পর জীব অন্তরাল ভোগ করে কর্মফল ভোগের জন্য পরলোকগমন করে। তখনই সে নিজেকে শরীরসম্পন্ন দেখে, যখন তার ভোগবাসনা উদ্রিক্ত হবে।

সে যে যা বলে বলুক। প্রেত কী বা কেন, জানার দরকার নেই ডুয়ার্সের মানুষের। ডুয়ার্স আছে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান। মাস্টারের বউ সতিনের প্রতিচ্ছায়া দেখে আয়নায়। রজনীর ঘরে কেউ কাশে। শিকারির তাঁবুতে কার সুর ভেসে আসে... কেউ জানে না আসলে কী ছিল! জানা-অজানার পিছনে ডুয়ার্স জমে আছে ঝিমঝিমে আবহাওয়ায়।

সাগরিকা রায়

নজির গড়ল জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা স্কুল

নজির গড়লেন জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা স্কুলের শিক্ষকরা। এক অভূতপূর্ব বিজ্ঞান মেলা। বিজ্ঞান মেলা বললেই আমরা বুঝি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়ের উপর প্রদর্শনী ইত্যাদি। কিন্তু এই মেলাটি ছিল শুধুমাত্রই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত খুদে পড়ুয়ারাই ছিল এই মেলার মুখ্য অংশগ্রহণকারী। ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে কীভাবে মডেল, চার্ট ইত্যাদি বানানো শেখানো যায়, তার প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের নিয়ে ২ ও ৯ জুলাই দু'টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন জলপাইগুড়ির বেলাকোবা ডিআইইটি-র সিনিয়র লেকচারার শর্মিষ্ঠা মজুমদার। এই প্রশিক্ষণের পর শিক্ষক- শিক্ষিকারা নিজের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার উপযুক্ত জিনিস তৈরিতে সাহায্য করেন। প্রথমে ওদের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সেই অনুযায়ী তারা নিজেদের খুশিমতো চার্ট ও মডেল বানায়।

২৮ জুলাই একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন হয়। ৩০ ও ৩১ জুলাই নানান উৎসবে মেতে ছিল স্কুল চত্বর। মোট পাঁচটি কক্ষে শহরের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আগত প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ২০০ জন ছাত্রছাত্রী তাদের তৈরি অপূর্ব সব মডেল ও চার্ট প্রদর্শন করে। প্রতিটি প্রদর্শনীকক্ষে বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয় থেকে উঁচু শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। প্রতি কক্ষে পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক ছিল। প্রত্যেক কক্ষে 'গেম কর্নার' ছিল। সেখানে শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। ছিল 'টিচারস' কর্নার'। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই অংশে তাঁদের ভাবনাগুলিকে মডেল ও চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরেন। 'সিনেপ্লেক্স' আর-একটি নতুন ভাবনা। এই অংশে প্রজেক্টরের দ্বারা ছাত্রছাত্রী ও দর্শনার্থীদের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিষয়ে চলচ্চিত্র দেখানো হয়। প্রথম দিন এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জুড়ে ছিল আরও দু'টি অনুষ্ঠান— কুইজ ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দিন বিচার হয়।

বিচারকমণ্ডলীটিও গঠন করা হয়েছিল অভিনব উপায়ে। বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত 'বিজ্ঞান মেলা' বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দু'জন করে ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটি বিচারকমণ্ডলী শর্মিষ্ঠা মজুমদারের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি কক্ষে প্রদর্শিত প্রতিটি মডেল পরিদর্শন করেন ও মূল্যায়ন করেন। সন্ধে সাতটা অবধি প্রদর্শনী চলার পর হয় পুরস্কার বিতরণী। মডেল ও চার্ট প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রবন্ধ, কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় তিনজন করে। বিদ্যালয়গতভাবে সব বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার জিতে নেয় সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয় এবং জেলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। অঙ্কন প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলির মধ্যে মডেল-চার্ট প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় চিত্রভারতী আর্ট স্কুল, জলপাইগুড়িকে।

পুরো অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করার পিছনে প্রধান উদ্যোগীরা হলেন— কৌশিক শিকদার (শিক্ষক, জেলা স্কুল), উমেশ শর্মা (প্রাক্তন শিক্ষক, সোনাউল্লা স্কুল), শর্মিষ্ঠা মজুমদার (অধ্যাপক, ডিআইইটি, বেলাকোবা) প্রমুখ। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই অভিনব উদ্যোগে আবেগে আপ্লুত হন জলপাইগুড়িবাসী।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস

‘ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব কোচবিহার’-এর উদ্যোগে গত ১৯ অগাস্ট

পালিত হল ‘বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস’। কোচবিহারের স্থানীয় সাহিত্যসভায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা দায়রা জজ পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রবালকান্তি ঘোষ। এই দিনটিতেই সংস্থার দশ বছর পূর্ণ হল বলে জানান সম্পাদক সুব্রত দাস। সেই উপলক্ষে স্থানীয় সদর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে এর আগেই ছোটদের যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল, তার বিজয়ীদের হাতে এ দিন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এই জেলার বাচিক শিল্পী চায়না চট্টোপাধায় এবং নাট্যশিল্পী দীপায়ন ভট্টাচার্যকে এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয়। এফপিএসি সম্মান প্রদান করা হয় বিখ্যাত আলোকচিত্রী হিমাদ্রিশখর ভট্টাচার্যকে। অনুষ্ঠানে তাঁর শিল্পকর্মের একটি ডিজিটাল প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছিল আয়োজক সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যদের তোলা ডিজিটাল আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি ছিল দেখবার মতো।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

দেখতে দেখতে ৩৩ বছর অতিক্রম করল কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি। সেই উপলক্ষে ১২ থেকে ১৬ অগাস্ট তারা স্থানীয় ল্যান্সডাউন হল ও জেনকিন’স স্কুল অডিটোরিয়ামে আয়োজন করেছিল লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনাসভার। ডুয়ার্সের এই ফিল্ম সোসাইটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. ডেনিস হ্যানলন এবং তাঁর ছাত্রী সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার কলকাতার মেয়ে স্বর্ণা পাল কোচবিহারে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু ব্যতিক্রমী ছবির সম্ভার, যা কোচবিহারের মানুষ এর আগে দেখেছেন বলে মনে হয় না। এই উপলক্ষ্যে কোচবিহারবাসী দেখতে পেলেন অসাধারণ মর্মস্পর্শী কিছু লাতিন ছবি। দর্শকদের কাছে ভাষা এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সংস্থার সহসম্পাদক শুভেন্দু ভট্টাচার্য জানান, চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের ভিন্ন স্বাদের ছবি দেখাতে পেরে ভীষণ ভাল লাগছে। এর আগে কোনও মহাদেশকে নিয়ে এ ধরনের ছবি এখানকার মানুষ দেখেনি। এবার চলচ্চিত্র উৎসবে প্রচুর মানুষের সাড়া পেয়েছি। বিশেষ করে ড. হ্যানলন খুব খুশি, সুযোগ পেলে আবার তিনি কোচবিহারে আসবেন বলে জানিয়েছেন। সংস্থার সদস্য শংকর দাশগুপ্ত কোচবিহারের ঐতিহ্য রাসমেলা ও রথযাত্রা নিয়ে তৈরি করা দু’টি তথ্যচিত্র ড. হ্যানলনের হাতে তুলে দেন বলেও জানান তিনি।

কবি প্রণাম

কোচবিহার জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল ‘বাইশে শ্রাবণ’ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। কবি তরুণ দাসের বাসভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাইশজন কবি, আলোচক ও বাচিক শিল্পী। কবি শুভাশিস চৌধুরীর রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনা অসম্ভব মনোগ্রাহী হয়েছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন চোখে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করেছেন গৌরাঙ্গ সিনহা, ড. অলোক সাহা, তরুণ দাস ও বিবেক চৌধুরী। কবির উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠ করেন সমীর দাস, প্রদোষবিন্দু দাশগুপ্ত, শিশিরকুমার নিয়োগী, সঞ্জয় সোম, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, রূপক সান্যাল-সহ অন্যান্যরা। বাচিক শিল্পী সুমন চক্রবর্তীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দু’ঘণ্টার এই কবি স্মরণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সঞ্জয় সোম। শেষে সমবেত কণ্ঠে ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’ অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন মাত্রা দেয়।

জলপাইগুড়িতে উদ্‌যাপিত হল ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফি ডে

জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল ‘ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফি ডে’। এই উপলক্ষে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়। প্রত্যেকে তাদের সর্বাধিক চারটি করে ছবি নিজের বিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে কমপ্যাক্ট ডিস্কে জমা দেয় এবং ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। ছবির জন্য নির্দিষ্ট কোনও বিষয় কিংবা সাইজ ধার্য করে দেওয়া ছিল না। ফলে প্রতিযোগীরা মনের আনন্দে খুশিমতো নিজেদের তোলা

পুরস্কার নিচ্ছে (ডানদিকে উপরে) দেবাদ্রি সরকার, (বাঁদিকে উপরে) গার্গী সরকার ও (বাঁদিকে পাশে) সাগ্নিক চৌধুরী

সেরা ফোটোগ্রাফগুলি নির্বাচন করার সুযোগ পেয়ে যায়। প্রতিযোগিতার শেষে ১৯ অগাস্ট প্রত্যেক প্রতিযোগীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মালদায় আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব

নাটককে কেন্দ্র করে এ এক মিলনমেলা। এপার বাংলা-ওপার বাংলা মিলেমিশে গেল নাটককে কেন্দ্র করে। সঙ্গী হল পড়শি রাজ্য ত্রিপুরাও। মহানন্দার তীরে এ মহামিলনমেলার আয়োজন করল মালদা মালঞ্চ নাট্য সংস্থা। ২২-২৭ অগাস্ট নাটকের এই মিলনমেলাকে কেন্দ্র করে মালদা তথা গৌড়বঙ্গের মানুষের মনে উৎসবের আবহ। ২২ অগাস্ট উৎসবের উদ্বোধন করলেন নাট্যকার প্রবীর গুহ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য নাট্য অভিনেত্রী রোশন জিন্নাত রুশনি। নাট্য উৎসবের বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, সম্পর্কের সংকট, সমাজ ও সময়ের ভয়ংকরতা, নারীকেন্দ্রিক বিষয় তথা উইলিয়াম শেকসপিয়রও। নাট্য উৎসবের বিভিন্ন দিনে যে নাটকগুলি রয়েছে: ২৩ অগাস্ট— চোর চরণদাস, নাটক: দেবতোষ দাশ, পরিচালনা: দীপঙ্কর পাল, প্রযোজনা: অনন্য থিয়েটার, কালিয়াগঞ্জ; ২৪ অগাস্ট— দু'টি নাটক— আমি মাধবী, নাটক ও নির্দেশনা: সঞ্জয় কর, প্রযোজনা: নাট্যভূমি, আগরতলা, ত্রিপুরা; বীরাঙ্গনার বয়ান, নাটক: রোশন জিন্নাত রুশনি, পরিচালনা: দেবাশিস ঘোষ, প্রযোজনা: শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্র, বাংলাদেশ; ২৫ অগাস্ট— ইলা গুঢ়েষা, নাটক: ব্রাত্য বসু, পরিচালনা: দেবাশিস (অভিনয়ে: গৌতম হালদার ও সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়); ২৬ অগাস্ট— লজ্জা, নির্দেশনা: রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী; ও লং মার্চ, নাটক: প্রবীর গুহ, নির্দেশনা: শুভদীপ গুহ, প্রযোজনা: অলটারনেটিভ লিভিং থিয়েটার; ২৭ অগাস্ট— ফাগুন রাতের গপ্পো, মূল নাটক: উইলিয়াম শেকসপিয়র, বাংলা রূপান্তর: সৌমিত্র বসু, নির্দেশনা: তরুণ প্রধান, প্রযোজনা: রবীন্দ্রভারতী রেপার্টরি। মালদহ মালঞ্চর নির্দেশক পরিমল ত্রিবেদী জানান, 'ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহযোগিতায় এপার বাংলা-ওপার বাংলার নাটক নাট্যমোদীদের দেখাতে চেয়েছি। আশা করি নাট্যমোদী মানুষ ভাল নাটক দেখতে পাবেন।'

সবুজ মিত্র

স্কুল ছাড়ার পঁচিশ বছর উদ্‌যাপন: এক অভিনব ভাবনা

গত ১৫ অগাস্ট এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের বিদ্যালয় ছাড়ার ২৫ বছর পূরণ উদ্‌যাপন করল জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ১৯৯১-এর ব্যাচ। নতুন ধরনের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার দাবি রেখেছে। সে দিন সকালবেলা স্কুলে গিয়ে চলতি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে ছোটবেলার স্বাদে স্বাধীনতা দিবস পালনে অংশগ্রহণ করল তারা। তারপর ছিল গানবাজনাসহ শহর পরিক্রমা। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ির প্রয়াস মঞ্চে 'বছর পঁচিশ পর' লেখা ফ্লেক্সটি থাকায় পুরনো দিনের কথা জ্বলজ্বল করে উঠছিল। উপস্থিত দর্শকাসনে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন তখনকার শিক্ষিকারা, যাঁরা গড়েপিটে মানুষ করার কাজটিতে অভিভাবকের পরেই এই ছাত্রীদের মন জুড়ে ছিলেন। শিক্ষিকারাও আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন সে দিন। 'অসতোমা সদ্গময়' গানটির সঙ্গে প্রদীপ হাতে নিয়ে নাচের মাধ্যমে একটি উষ্ণ আহ্বানের পরিবেশ রচিত হয়। সমবেত সংগীত 'ধ্বনিল আহ্বান' হয়ে গেলে শিক্ষিকাদের মঞ্চে ডেকে নিয়ে সংবর্ধনাজ্ঞাপনের বদলে 'ভালবাসায় ও শ্রদ্ধায়'— এই নাম দিয়ে সসম্মানে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফুল এবং ছোট্ট উপহার। শিক্ষিকারা তাঁদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে এইসব ছাত্রীর প্রতি তাঁদের অনুভূতির কথা, পড়ানোর দিনগুলোতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, শাস্তি দেওয়া— সব বলতে বলতে ফিরে গিয়েছিলেন সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলোতে। এখন ঠিক এমন সম্পর্ক কি তৈরি হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের, যাঁরা পঁচিশ বছর পরও তাঁদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল? কিংবা এমন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও কি আজ বিরল নন, যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের নিজের সন্তানের চাইতে কোনও অংশে কম মনে করেননি কোনও দিন? এমনকি পঁচিশ বছর পরও তাঁদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি! স্কুলে যেসব নাচ-গানে এঁরা অংশ নিতেন, সেগুলো দিয়েই সাজানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠানটি। স্মৃতির মোড়ক খুলে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। আর-একটি মজার বিষয় হল, এঁদের সন্তানরাও নাচে-গানে মুগ্ধ করেছিল সকলকে। মায়েরা সব ছোট্টবেলার স্কুলের বন্ধু, এতকাল পরেও তারা একই রকম আছে, এটা কি ওদের কাছে কম কথা! ঘড়িতে তখন ন'টা। একজন শিক্ষিকা কিংবা অভিভাবকও আসন ছেড়ে উঠে যেতে পারেননি, এতটাই স্মৃতির বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন সকলে। 'এক টুকরো গভর্নমেন্ট গার্লস' নামে নৃত্য-গীত সহযোগে সুন্দর একটি পরিবেশনার পর ধীরে ধীরে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তির দিকে এগয়। স্বাধীনতা দিবসে এমন এক একতার নিদর্শন সত্যিই অন্যরকম মাত্রা বহন করে।

অবশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে নতুন আহ্বানের বার্তা দিয়ে— রাখিবন্ধনের বার্তা, মিলনের বার্তা, 'পাশে আছি, পাশে থাকব' এই বার্তা। অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেন শিক্ষিকারা। আবেগ ধরে রাখতে পারেননি প্রাক্তনীরাও। মনের মধ্যে সারাজীবন সযত্নে লালন করা টুকরো টুকরো স্মৃতির ভাঁড়ারে আরও একটি অমূল্য স্মৃতি সঞ্চিত হল সে দিন।

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

অরণ্য মিত্র

জগন্নাথের মোবাইল ডিটেইল অবশেষে হাতে পেলেন কনক দত্ত। শ্যামল হত্যারহস্যের পিছনে ছুটতে গিয়ে এবার যেন তিনি ঘরের কাছে এক অপ্রত্যাশিত সূত্রের খোঁজ পেলেন। পল অধিকারীর তল্লাশি করতে গিয়ে দাসবাবু আর নদিয়া মুখুজ্জের কথোপকথনে উঠে এল চিন দেশে লাল চন্দনের বিপুল চাহিদার নেপথ্য কারণ। পল অধিকারীকে দিয়ে ঠিক কী করাতে চাইছেন দাসবাবু? ক্যাভেন্ডিস নামক আরও একটি রহস্যময় চরিত্রের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণের অছিলায় কী কথা হল বুদ্ধ ব্যানার্জির? ডুয়ার্সে অপরাধচক্রের জাল বিস্তারে জঙ্গিদের জড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার মাস্টারমাইন্ড আসলে কারা? বিতর্কিত মেগাসিরিয়ালের আরেকটি জমাটি পর্ব এই সংখ্যায়।

৪৯

দু'জনেরই অল্পবিস্তর নেশা হয়েছে। ঠিক হয়ে গিয়েছে যে, দাসবাবু এবং নদিয়া মুখুজ্জে আজ রাত্তিরটা কাঠের মিলের আপিসেই কাটাবেন। এখান থেকে তিন কিলোমিটার গেলেই জনপদ পাওয়া যায়। সেখানে ছোট বাস থামে। বাজার আছে। দরকারি জিনিসপত্র মোটামুটি পাওয়া যায় এখানে। নদিয়া মুখুজ্জে ফোনে কাউকে বলে দিয়েছেন সেখান থেকে রুটি আর মাংস নিয়ে আসার জন্য।

অনেকদিন পরে দেখা, তাই গল্প জমেছিল প্রচুর। সেসব মোটামুটি শেষ হলে নদিয়া মুখুজ্জে কিঞ্চিৎ টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি শুরুতেই দীননাথ চৌহানের নাম করলেন কেন বলুন তো? সে তো একটা ভেজিটেরিয়ান।'

'বলছি।' দাসবাবু টেবিলে পা তুলে দিয়ে আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিলেন। তাঁকে বেশ ফুরফুরে দেখাচ্ছিল। নদিয়া মুখুজ্জে বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে যাচ্ছেন দেখে তাঁর মনে বেশ শান্তি এসেছে।

'আসলে আমাদের গ্রুপের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে বাজারে। নাম হল ডার্ক ক্যালকাটা। অলরেডি আমাদের দু'জনকে খুন করেছে। শুনলে দুঃখ পাবে যে, বিজু প্রসাদকে উপরমহল সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাকে ধরলে উই অলরেডি লস্ট থ্রি। ভেরি রিসেন্টলি শিলিগুড়িতে আমাদের এক ক্লায়েন্টকে গুলি করা হয়েছে। হেভি রাইফেল থেকে ছোড়া বুলেট। সাইলেন্সার ছিল। এই মাল গোটা নর্থ-ইস্টে কয়েকটা আছে। সব ক'টাই কোনও না কোনও টেররিস্ট গ্রুপের হাতে। কী বুঝলে?

'আপনার প্রতিপক্ষ কোনও টেররিস্ট গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।' নদিয়া মুখুজ্জে মৃদু মৃদু হেসে বললেন, 'একেই বলে কর্মফল দাদা! বিশ বছর আগে কেএলও জঙ্গিদের কাছে আর্মস যারা বেচেছিল, আপনি তাদের একজন।'

'যাদের কাছে বেচেছিলাম, তাদের কাউকে মনে আছে মুখুজ্জেবাবু?' দাসবাবু টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন— 'তাদের মধ্যে মোস্ট ট্যালেন্টেড কে ছিল?'

'নো ডাউট, পল অধিকারী। শুনেছি সে নাকি ডেড। ভুটান গভর্নমেন্টের সঙ্গে টাই আপ করে ইন্ডিয়া যে স্টেপটা নিয়েছিল, তখনই নাকি মরেছে?'

'রং। হি ইজ জীবিত।'

'শিয়োর আপনি?' নদিয়া মুখুজ্জের টলোমলো ভাব কেটে গেল— 'তার মানে আপনি পল অধিকারীকে দলে টানতে চাইছেন?'

'ভেরি সিম্পল। কিন্তু তাকে খুঁজে বার করতে হবে।' আবার শরীরটা এলিয়ে দিলেন চেয়ারে দাসবাবু— 'চায়নায় লাল চন্দন পাচার করে এমন কাকে জানেন আপনি?'

'ক'জন লাগবে আপনার?' নদিয়া মুখুজ্জে বেশ গর্বের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'চায়নায় দর কত যাচ্ছে এখন জানেন?'

'বেস্ট কোয়ালিটি হলে আশি লাখ টু ওয়ান ক্রোর পার টন।'

'তবেই বুঝুন!' নদিয়া মুখুজ্জে বসলেন এবার চেয়ারে— 'শালা, সব লাল চন্দনই তো

ফাইনালি যায় চায়নায়। কী করে ওরা বলুন তো দাদা? ফার্নিচার বানায়? লাল চন্দনের নির্যাস থেকে শুনেছি মেডিসিন হয়!'

'এই কাঠ খুব ভাল তাপ শুষে নিতে পারে, সেটা জানেন?'

'মানে কুলিং করে?'

'ইয়েস দাদা! কুলিং। চায়নাতে এই কাঠ আসলে লাগে পরমাণু চুল্লিগুলিকে ঠান্ডা রাখার জন্য। যদিও এসব চায়নার গম্মেন্ট স্বীকার করে না। বাট আই নো। দামটা সেই কারণেই।'

'বলেন কী!' নদিয়া মুখুজ্জেকে উত্তেজিত দেখাল— 'নিউক্লিয়ার বোমা তো শেষে ইন্ডিয়াতেই মারবে ওরা! ওদের কাছে লাল চন্দন পাঠানো তাহলে তো একদম উচিত নয়। আমাদের গম্মেন্ট এসব জানে নিশ্চয়ই?'

'আন্দাজ তো করেই। ন্যাশনাল পলিটিক্সের ব্যাপার। প্রমাণ না পেলে অফিশিয়ালি বলবে কীভাবে আমাদের গম্মেন্ট?' দাসবাবু হাসলেন— 'পাচারের ব্যাপারে কড়া হবে আর নেক্সট ইয়ারে দেখবেন চন্দনের প্রাইস পার টন সওয়া কোটি হয়ে গিয়েছে। তা এসব নিয়ে আমাদের হেডেক নেই। পল অধিকারীকে এখনও যারা লিডার মানে, তারা অলমোস্ট সকলেই লাল চন্দন পাচারের সঙ্গে এখন ইনভল্ভ্ড আছে।'

'আমি এদের একজনকে চিনি। নগেন বর্মন। উল্লাডাবড়ি বলে একটা জায়গায় থাকে। জলপাইগুড়ি আর ময়নাগুড়ির মাঝখানে।'

'আমি জানতাম আপনার কাছ থেকে পল অধিকারীর টিমের কোনও না কোনও খবর মিলবে।' দাসবাবু আরেকটু পানীয় গলায় ঢেলে যেন সজীব হয়ে উঠলেন। নদিয়া মুখুজ্জেও দেখাদেখি গলা ভেজালেন একটু। তারপর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বললেন, 'পল যদি বেঁচে থাকে, তবে কোথায় আছে, সেটা ওর লোকেরা জানবে। কিন্তু আপনাকে বলবে কি?'

'কোথায় আছে, সেটা ফ্যাক্টর না মুখুজ্জেদাদা! সেটা না বললেও চলবে। শুধু আমার একটা মেসেজ পল অধিকারীর কাছে পৌঁছে দিলেই হবে। আমি ফিফটি ল্যাক একটু ব্যাগে ভরে ওর লোকের হাতে দিয়ে দেব। আপনি তো জানেন যে কেএলও গ্রুপের যারা এখনও ধরা পড়েনি, তাদের টাকার দরকার আছে। পল অধিকারীর তো আরও বেশি করে দরকার আছে। পুলিশ যাকে মৃত বলে জানে, তাকে কাজে লাগাবার সুবিধাটা আমার চাই।'

'তার মানে আপনারা এবার পালটা মারতে শুরু করবেন?' নদিয়া মুখুজ্জের মুখ দেখে মনে হল, তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন— 'পলকে দিয়ে অপারেশন করাবেন? ডার্ক শেয়ালদা না ক্যালকাটা— কী একটা নাম বললেন একটু আগে, তারা কাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে?'

দাসবাবু চুপ মেরে গেলেন। কারণ এই উত্তরটা তাঁর স্পষ্টভাবে জানা নেই। জঙ্গিদের ওরা কাজে লাগাচ্ছে কি না, সেটাও দাসবাবুর কাছে এখনও একটু আবছা। তবে নবীন রাইকে যে ধরনের রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, সেটা কোনও জঙ্গি টিমেরই হওয়া উচিত। কিন্তু সে জঙ্গি যে কেএলও-র কোনও শাখা হবে, তা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই।

'আইএস-এর জঙ্গিরাও হাত মেলাতে পারে আপনার প্রতিপক্ষের সঙ্গে।' নদিয়া মুখুজ্জে বেশ সিরিয়াস মুখ করে বললেন। যদিও তিনি 'আইএস' প্রসঙ্গটা রসিকতার সুরেই তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাসবাবুর জবাবে বোঝা গেল, তিনি হালকাভাবে গ্রহণ করেননি প্রসঙ্গটা।

'অসম্ভব কিছু নয় দাদা!' দাসবাবু বললেন, 'সেটা হয়ে থাকলে পল অধিকারীই ভরসা। অবশ্য আইএস জঙ্গিদের সঙ্গে কেএলও হাত মেলাবে না বলেই মনে হয়।'

দাসবাবু চুপ করলেন। বোতল প্রায় শূন্য। নতুন করে খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নদিয়া মুখুজ্জে। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছে একটানা ঝিঁঝিপোকার ডানা নাড়ার শব্দ।

৫০

বুদ্ধ ব্যানার্জি হাঁটছিলেন। ভোরবেলায় হাঁটতে বার হন তিনি। গাড়ি তাঁকে মহসীন আলি পার্কের কাছে নামিয়ে দেয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের রাস্তাটা দিয়ে কলেজ স্ট্রিট বেয়ে চলে আসেন কলেজ স্কোয়্যারে। একসময়ে সেখানকার সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে ফিরতেন। এখন চৌকো এলাকাটাকে পাক দিয়ে, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট ধরে সংস্কৃত কলেজের সামনে দিয়ে ফের এসে ওঠেন গাছপালা ঘেরা প্রেসিডেন্সি কলেজের মুখে। সেখানেই অপেক্ষা করে তাঁর গাড়ি। আজকে অবশ্য হাঁটার পাশাপাশি জরুরি একটা কাজ ছিল বুদ্ধ ব্যানার্জির। তাই সংস্কৃত কলেজের সাদা-লাল বিল্ডিংটা পেরিয়ে তিনি ডান দিকের রাস্তাটা ধরলেন। কলেজপাড়া এখনও জাগেনি। মিনিট পনেরো হল দিনের আলো ফুটেছে মাত্র। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব চারদিকে। একটা চায়ের দোকান খুলেছে মাত্র এই রাস্তাটায়। বুদ্ধ ব্যানার্জি জানতেন যে দোকানটা কাকভোরেই খুলে যায়। হালকা হলুদ সোয়েটার পরা ক্যাভেন্ডিসকে দেখা গেল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

ক্যাভেন্ডিসের সঙ্গে দেখা করাটা আজকের প্রাতঃভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ ব্যানার্জির। ক্যাভেন্ডিসের আসল নামটা কেউ জানে না। সে কোন রাজ্যের লোক, সেটা বোঝা মুশকিল। বাংলা তো বটেই, হিন্দি, তামিল আর পাঞ্জাবি ভাষাটাও ক্যাভেন্ডিস বলতে পারে অনায়াসে। কোনটা নিজের ভাষা, সেটা বোঝা অসম্ভব হয়ে যায়। দিল্লি থেকে গতকাল বিকেলে এসেছে সে কলকাতায়। সকাল ন'টা নাগাদ একটা ফ্লাইট ধরে আবার ফিরে যাবে। বুদ্ধ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করাটা তাঁর অতি জরুরি।

ক্যাভেন্ডিস দূর থেকে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে আসতে দেখে হাতছানি দিল। মোটামুটি লম্বা চেহারা। গায়ের রং কালোর দিকে। মাথায় কদমছাঁট চুল। থুতনিতে একটু দাড়ি। গোল মুখে একটা সাধারণ চশমা।

'কেমন আছেন দাদা?' ক্যাভেন্ডিস কয়েক পা এগিয়ে এসে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে ওয়েলকাম জানাল।

'ফাইন।' বুদ্ধ ব্যানার্জি অমায়িক হেসে জানালেন। ক্যাভেন্ডিস হো হো করে হেসে বলল, 'এই জন্যই তো আপনাকে এত লাইক করি দাদা! অলওয়েজ হ্যাপি ফেস আপনার। দেখলেও ভাল লাগে।'

'জায়গাটা ভাল পছন্দ করেছ। তা কতক্ষণ লাগবে বলো তো? আমাকে আবার প্রেসিডেন্সির সামনে হেঁটে ফিরতে হবে। বুড়ো হচ্ছি। বেশি হাঁটাহাঁটি আর নিতে পারি না।'

'কী যে বলেন!' ক্যাভেন্ডিস আবার হাসল— 'পাঁচ মিনিটের মিটিং। আরেকটা সিগারেট ধরাই। সিগারেটের আগে কথা ফিনিশ হয়ে যাবে। এখানেই দাঁড়াই। মিটিং-এর জন্য একদম ঠিকঠাক। এইসব রাস্তা দিয়ে আপনাদের বেঙ্গলের গ্রেট গ্রেট লোকজন যাওয়া-আসা করেছেন। কত প্ল্যান করেছেন। আমরাও প্ল্যান করি, কী বলেন?'

'আমরাও গ্রেট লোক, তা-ই না?' বুদ্ধ ব্যানার্জি এবার একটু হাসলেন। ক্যাভেন্ডিস এইরকমই। দেখলে বোঝা যায় না যে কম্পিউটারের ভাষা তার গুলে খাওয়া। এটাও বোঝা যায় না যে, মাত্র দু'ঘণ্টার নোটিশে দেশের যে কোনও প্রান্তে সে কাউকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারে লোক লাগিয়ে। এমনই নেটওয়ার্ক। দিল্লির অধিকাংশ কাজ সে একাই সামলায়।

'কথা খুব বেশি নেই দাদা! আপনাদের ডুয়ার্সে যা হচ্ছে তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। এখন দিল্লির অর্ডার হল ধীরে চলো। গো স্লো। ওরা আমাদের ডেটাবেস হ্যাক করেছে খানিকটা। সেটা সামলে নিয়েছি। পালটা হ্যাকিং চালু হয়ে যাবে। ইনফর্মেশন মিলবে। সেইমতো কাজ হবে। আপনি দাদা স্রেফ দুটো কাজ করে ফেলুন।'

'কী কাজ?'

'রঞ্জিতকে দিয়ে চাইনিজ স্যাটেলাইট ফোনের ডিলটা সেরে ফেলুন, আর ডুয়ার্সের কোথাও একটা এক্সপ্লোশন ঘটিয়ে দিন। আপনি স্পট বলে দিলেই আমি লোক দিয়ে টাইম বোমা ফাটিয়ে দেব। জোর ফাটবে, কিন্তু লোক মরবে না। দু'-এক পিস উড়ে গেলে যাবে। রাতের বেলা কোনও একটা বাজারে

ফাটিয়ে দেব।'

'গুড আইডিয়া।' বুদ্ধ ব্যানার্জি প্রশংসার সুরে বললেন, 'পুলিশ কড়া স্টেপ নেবে। ডার্ক ক্যালকাটা যাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, তারা বেশ কিছুদিনের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড চলে যাবে।'

'একদম ঠিক বুঝেছেন দাদা! দরকারে দশ-বারো দিন পর আবার একটা এক্সপ্লোশন হবে।'

'কিন্তু একটা প্রবলেম হবে ক্যাভেন্ডিস!' বুদ্ধ ব্যানার্জি চিন্তিত সুরে বললেন, 'আমরা পল অধিকারীকে খুঁজছি। বোমা-টোমা ফাটলে সে সাবধান হয়ে যাবে।'

'সাবধান হবে, আবার কনফিউজডও হবে।' ক্যাভেন্ডিস চোখ পিটপিট করে বলল, 'ডুয়ার্সে কনফিউশন তৈরি করতে হবে দাদা! টেররিস্টদের গ্রুপগুলো কনফিউজড হলে খেলা জমে যাবে। তা পল অধিকারীকে ফাইন্ড আউট করার জন্য তো দাসবাবুকে লাগিয়ে দিয়েছেন শুনলাম?'

'পারলে সে-ই পারবে।'

'একদম।' ক্যাভেন্ডিসের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে— 'দাসবাবু গ্রেট ম্যান। আমরাও গ্রেট। চলুন, সবাই মিলে ডুয়ার্সে শান্তি ফিরিয়ে আনি।'

বলতে বলতে আরও একটু হেসে নিল ক্যাভেন্ডিস। যেন খুব একটা মজার কিছু হতে যাচ্ছে ডুয়ার্সে।

৫১

সারাদিন মেঘলা। মাঘ মাসের বেলাটা একটু আগেই ঝপ করে ফুরিয়ে গেল। রাস্তাঘাটের আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। কনক দত্তর বাড়ির সামনে দণ্ডায়মান ল্যাম্পপোস্টের আলোটা জ্বলতেই তিনি টের পেলেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাড়িতে এই মুহূর্তে তিনি একা। নিজের ঘরে বসে এক মনে ভেবে যাচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। অন্ধকার টের পাওয়ার পর এইমাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন।

গোটা ব্যাপারটাই গোড়া থেকে সাজাচ্ছিলেন তিনি। ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি ট্রাফিকে বদলি হয়ে যাওয়া সেই ছোকরা জগন্নাথের ফোন রেকর্ড বার করে ফেলেছে। দুপুরের দিকে ফোন করে সেটা জানিয়েছিল সে। পরি ঘোষালের হাতে সে রেকর্ড বিকেলে দিয়ে দেবে। ঘোষাল মেইল করে দেবে সে রেকর্ড। এমনিতে জগন্নাথকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করার অস্ত্র হাতে মজুত থাকলেও কনক দত্ত এখনই সেই কাজটা করতে চাইছেন না। এটা ঠিক যে, কাশিয়াগুড়ি থেকে শ্যামল নিখোঁজ হওয়ার দিন জগন্নাথের সঙ্গেই ছিল। তাকে কাজের টোপ দিয়ে ময়নাগুড়িতে যে জগন্নাথই আনিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু শ্যামলের কল রেকর্ডে জগন্নাথের নাম্বার নেই। এটা একটা খটকা। শ্যামলের সঙ্গে জগন্নাথের যোগাযোগের আর কোনও সেতু ছিল কি? মাঝখানে কেউ নিশ্চয়ই আছে, যার মাধ্যমে শ্যামল এবং জগন্নাথের যোগাযোগ হত। পরি ঘোষাল রেকর্ডটা মেইল করলে এই খটকাটা কেটে যাবে বলেই কনক দত্তর মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা কেবল এইটুকুই নয়। জগন্নাথ হল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তাকে যারা নিয়োগ করেছে, তাদের খুঁজে বার করাটাই হবে আসল চ্যালেঞ্জ। এই মুহূর্তে জগন্নাথকে গ্রেপ্তার করলে তার নিয়োগকর্তারা সাবধান হয়ে যাবে। অবশ্য আরও কয়েকটা ব্যাপারেও কনক দত্তর খটকা দূর হচ্ছে না। শ্যামলের মতো একজন নিরীহ ছেলেকে এইভাবে প্ল্যান করে কাশিয়াগুড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল কেন? এটা নিশ্চিত যে, শ্যামল কিছু একটা জেনে ফেলেছিল, কিন্তু সেই জানাটা ঠিক কী? নেপালি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করে ভেগে যাওয়ার থিয়োরিটা বিশ্বাস করে পুলিশ কেসটা ক্লোজ করে দিয়েছে। এটাও একটা গুরুতর খটকা। উপরমহল থেকে চাপ এলেই যে পুলিশ এমন বিচিত্র কাজ করে, তা কনক দত্ত নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ ভালভাবেই জানেন। এই দুটো খটকা মিলিয়ে দিলে যেটা দাঁড়ায় তা হল এই যে, শ্যামলের ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে উপরতলার গণ্যমান্য মহলের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেই গণ্যমান্য মহলের কেউ নিশ্চয়ই জগন্নাথের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেনি।

কনক দত্ত ঘড়ি দেখলেন। প্রায় ছ'টা বাজে। পরি ঘোষালের মেইল চলে আসার কথা। মেইল করেই সে এসএমএস পাঠিয়ে দেবে অথবা ফোন করবে। জগন্নাথের ফোন রেকর্ডটা হাতে না আসা অবধি খটকাগুলোর কোনও সমাধান পাওয়া যাবে না। তবে জগন্নাথ যেমন তার ধর্মবাপের সিম কার্ড ব্যবহার করছে, তেমনই তার নিয়োগকর্তার পক্ষেও অন্যের সিম ব্যবহার করাটা অস্বাভাবিক কিছু হবে না। তেমন ঘটলে ফোন নাম্বার থেকে বিশেষ কিছু মিলবে না।

ভাবতে ভাবতেই পরি ঘোষালের ফোন এল। কনক দত্ত লাফ দিয়ে টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে বললেন, 'লিস্ট পেলেন?'

'আরে মশাই, একটা বিশেষ নাম্বারে দিনে দশ-বারোটা ফোন করে ওই জগন্নাথ। আমি একটু আগেই লিস্টটা পেলাম।'

'লিস্টটা মেইল করেছেন?'

'এই তো করলাম। সেই বিশেষ নাম্বারের লোকেশনটা শুনলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন।'

'কেন?'

'বেশির ভাগ সময়েই নাম্বারের লোকেশন বলছে কাশিয়াগুড়ি। ওইখানেই থাকত না শ্যামল ছেলেটা?'

'কাশিয়াগুড়ি!' কনক দত্ত প্রথমে অবাক এবং পরমুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন— 'আমি রেকর্ডের লিস্টটা দেখে নিয়ে আপনাকে ফোন করছি।'

ল্যাপটপ চালু করে মেইল থেকে লিস্টটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট বার করে নিতে এর পর কনক দত্তর সময় লাগল কয়েক মিনিট। সেই বিশেষ নম্বরের মালিকের নাম বলা হয়েছে রাজু থাপা। গত সাত দিনে মাত্র একদিন সেই নাম্বারের লোকেশন ছিল বানারহাট। বাকি ছ'দিন কাশিয়াগুড়ি। প্রতিদিন গড়ে আট-দশবার ফোন করেছে জগন্নাথ সেই নম্বরে। কখনও কখনও সে নাম্বার থেকে ফোনও এসেছে জগন্নাথের ধর্মবাপের সিম কার্ডে।

কনক দত্ত কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন। কিছু একটা মনে করতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছিল না। খানিকক্ষণ অস্থিরচিত্তে ঘরময় পায়চারি করে বেড়ালেন তিনি। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'রাইট! কন্যাসাথি! নিখোঁজ হওয়ার দিন ভোরবেলায় শ্যামল ফোন করেছিল কন্যাসাথির ম্যাডামকে।'

তারপর সোফায় পড়ে থাকা নোটবুকটা উলটে খুঁজতে লাগলেন উক্ত ম্যাডামের নাম্বার। কিন্তু সে নাম্বারের সঙ্গে জগন্নাথের কল রেকর্ডে পাওয়া বিশেষ নাম্বার মিলিয়ে আবার ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন কনক দত্ত। ম্যাডামের নাম্বারটা বিলকুল আলাদা। মিনিটকয়েক সোফায় চুপ করে বসে থাকার পর কনক দত্ত ভাবলেন উক্ত নাম্বারে একটা ফোন করবেন। ভাবামাত্রই করে ফেললেন ফোনটা। কিন্তু ওপারে কেবল রিং হয়েই গেল।

দ্বিতীয়বার কল করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলে কনক দত্ত। বড় বেশি তাড়াহুড়ো করতে যাচ্ছিলেন তিনি। নাম্বারটা যারই হোক না কেন, তার মনে এখনই কোনও সন্দেহ ঢুকতে দেওয়া চলবে না। তবে কাল সকালে কাশিয়াগুড়িতে কন্যাসাথির অফিসে একবার হানা দিতেই হচ্ছে। তাঁর মন বলছে যে, গোটা ঘটনাটার সঙ্গে কন্যাসাথির কোথায় যেন একটা সম্পর্ক আছে। উধাও হয়ে যাওয়ার দিন অত ভোরে শ্যামল কেন ফোন করেছিল কন্যাসাথির ম্যাডামকে? যে খবরটা সে দিয়েছিল, সেটা পরে দিলেও তো চলত! শ্যামল কি আরও কিছু বলেছিল সে দিন ফোনে?

'ম্যাডামকে একবার যাচাই করা দরকার।'

বিড়বিড় করে নিজের মনেই কথাটা উচ্চারণ করলেন কনক দত্ত।

(ক্রমশ)

শ্রীমতী ডুয়ার্স

প্রয়োজনে নিজেই অজগরও ধরে ফেলেন বীথি চক্রবর্তী

গাজলডোবার কাছে টাকিমারি গ্রামে আলাপ হল বীথি চক্রবর্তীর সঙ্গে। অন্য একটি কাজে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে ওঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সাবেকি উঠোনে আমাদের বসতে দিলেন দু'টি ফাইবারের চেয়ারে। তখনও জানি না এই মহিলা নিতান্ত সাধারণ এবং ঘরোয়া ধরনের নন। যদিও তাঁর ঘরকন্না দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু কথাবার্তায় ধীরে ধীরে মোড়ক খুলতে লাগল। নানান গল্প শুনতে শুনতে বুঝলাম ইনি ব্যতিক্রমী। এলাকার এবং এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে ৩৮০টি 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' তৈরি করেছেন একলার প্রচেষ্টায়। নিজেও কাজ করেন আশাকল্প প্রকল্পে। এলাকায় পৌঁছে বীথিদি কিংবা বাণীদি (ডাকনাম) বললেই এক ডাকে চিনে যান সকলে। এমন মানুষ পাওয়া ভার, যার বিপদে পাশে দাঁড়াননি তিনি। রাত দুটোয় কেউ অসুস্থ হয়েছে, কেউ না যাক, বীথিদি চলে যাবেন তার বাড়িতে। প্রয়োজনে তাঁকে নিয়ে চা-বাগানের গাড়ি ডাকিয়ে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রওনা দেন একাই। এমন ঘটনা বারংবার ঘটেছে এবং ঘটছেও। সকলের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঐকান্তিক ইচ্ছে এভাবেই তাড়িয়ে বেড়ায় ওঁকে। শুধু অসুস্থতা নয়, কারও কোনও অফিশিয়াল কাগজপত্রের কাজ ঠিকঠাক এগোচ্ছে না জানলে সেদিকেও নজর দেন তিনি। নিজেই দৌড়ে যান প্রয়োজনীয় দপ্তরে। দরকার হলে যুক্তিসহ গলার জোর খাটিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ আদায় করে তবে ছাড়েন।

আমার সঙ্গে কথা বলার সময় একবারও মনে হয়নি, নিজেকে জাহির করার উদ্দেশ্যে তিনি এতসব বলছেন। আমি আমার 'শ্রীমতী'কে খুঁজতে গিয়ে একে একে নানান প্রশ্নের জাল বিছিয়ে দিলাম ওঁর সামনে। উত্তর পেতে পেতে যা যা জানলাম, তার মধ্যে সবচাইতে রোমহর্ষকটি এবার বলি। ২০১২ সালের ঘটনা। ওঁর বাড়িটি দোতলা, কাঠের মেঝে আর টিনের ছাউনি দিয়ে বানানো পরিপাটি একটা আস্তানা। পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতায় শহরের অনেক দামি বাড়িকেও হার মানায়। বাড়ির লাগোয়া বেশ বড়সড় একটি পুকুর, সেটি বড় বড় মাছের স্বাভাবিক প্রজননক্ষেত্র। পুকুরের পিছনে রীতিমতো জঙ্গল। সেখানে সাপখোপের দৌরাত্ম্য খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তখন বর্ষাকাল। জলপাইগুড়ি থেকে কাজ সেরে ফিরে সবে ভাত খেতে বসেছেন, দুপুর-বিকেলের সন্ধিক্ষণে, তিনটে-সাড়ে তিনটে হবে। হঠাৎ খবর এল, পুকুরের পিছন দিকের জঙ্গলে একটা সাপ, মনে হচ্ছে অজগর। এও জানা গেল, কয়েকটা ছেলে মিলে ওটাকে নিয়ে কোনও ফন্দি আঁটছে। ভাতের থালা ফেলে ছুটে গেলেন সেখানে। দেখে যা বুঝলেন, অজগরটিকে চুরি করার চেষ্টা করছে ছেলেগুলো। প্রথমে ভালভাবে কথা বললেন, ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে ওটা বন দপ্তরের সম্পত্তি, ওকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। কোনও লাভ হল না বুঝিয়ে। তারপর শুরু হল তর্কাতর্কি। ছেলেগুলো অজগরটিকে বস্তায় ভরে নিয়ে যাবে, বীথি কিছুতেই নিতে দেবেন না। বেগতিক দেখে ছেলেগুলো এবার টাকা দিতে চাইল। অজগরটি ওদের হাতে ছেড়ে দিলে কয়েক লাখ টাকা দেবে বীথিকে। কোনও প্রশ্নই ওঠে না। টাকার লোভে সবাইকে ভোলানো যায় না। খেপে উঠলেন ঠান্ডা মাথার মানুষটি। কোনও কথা না বলে একলা একলা কারও সাহায্য ছাড়াই অজগরটিকে ঢোকানোর চেষ্টা করলেন বস্তার মধ্যে। বহু চেষ্টার পর মুখ তো ঢুকে গেল, কিন্তু শরীর? শক্তিতে কি কুলায়? তবু ওকে বাঁচানোর তাগিদে কোথা থেকে যেন শক্তিও জুটিয়ে দিলেন ঈশ্বর। ছেলেগুলো পালিয়ে গেল। বন দপ্তরকে খবর পাঠানো হল। সেই সঙ্গে শুরু হল অপেক্ষা। টানতে টানতে সেই বস্তা নিয়ে এলেন নিজের বাড়ির উঠোনে। গাছের সঙ্গে বস্তাটিকে বাঁধলেন। ঠায় বসে রইলেন পাশে। না পারছেন ঘরে যেতে, না পারছেন বাথরুমে যেতে, পাছে চুরি হয়ে যায়। চোখের আড়াল করার উপায়ই নেই। অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ দেখেন, সাপটি চটের বস্তা কেটে দিব্যি বেরিয়ে আসছে। দৌড়ে গিয়ে আর-একখানা বস্তা এনে তার মধ্যে পুরলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে সেটাও কেটে ফেলল। আবার একটা বস্তা, সেটাও। অগত্যা উপায় না দেখে প্লাস্টিকের বস্তায় ঢোকালেন ওকে। কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। বেশিক্ষণ থাকলে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, তাই ঘন ঘন তাগাদা দিতে লাগলেন নির্দিষ্ট কর্মীদের, যাতে তাঁরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছে যান। নামল মুষলধারায় বৃষ্টি। একা বসে ভিজতে লাগলেন বীথি। ঘরে গেলেই যদি বস্তাটা উধাও হয়ে যায়! যত কষ্টই হোক, অজগরটিকে ওর নিজের বাসস্থানে পৌঁছে দিতেই হবে। তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর গাড়ি এসে দাঁড়াল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বীথি। অজগরটিকে উদ্ধার করে ওর নিজের জায়গায় ফিরিয়ে দিতে পেরে সেই যে এক তৃপ্তির হাসি মুখে লাগল, আমাকে গল্পটি করার সময়ও তা মলিন হয়নি।

মানুষের প্রতি মানুষের এবং মানুষের প্রতি বন্য প্রাণের বিশ্বাস কমেছে, ভরসা কমেছে। মানুষই সে জন্যে দায়ী। আবার মানুষই পারে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে। শুধু নিজের বিবেককে সজাগ রাখা চাই। বিপদে-আপদে সকলের পাশে থেকে সাহায্য করা— এটুকু সৎ ইচ্ছে অন্তত মানুষের মতো উন্নত জীবের কাছ থেকে আশা করা যেতেই পারে। ঘরে ঘরে বীথিদি তৈরি হোক। 'এখন ডুয়ার্স'-এর তরফ থেকে তাঁর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

শ্বেতা সরখেল

ভ্রম সংশোধন

গত ১৭ অগাস্ট সংখ্যার 'এবারের শ্রীমতী'তে ('শুধু সৃজনশীলতা নয়, তাকে বাণিজ্যে সফলও করতে চান যে গৃহবধূ') 'রিমি পাল চৌধুরী বসু'র জায়গায় 'রিনি পাল চৌধুরী বসু' ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

রূপসী ডুয়ার্স

পুজোর সাজ ১

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

বর্ষা ঋতু ধরিত্রীকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে মা দুর্গা আসছেন বলে। প্রকৃতিরও সাজো সাজো রব। শরৎ ঋতু মাকে আহ্বান জানাচ্ছে। মা দুর্গাকে স্বাগত জানাতে শুধু প্রকৃতির সাজো সাজো রব নয়, তরুণ তরুণীদের মধ্যেও জেগে উঠেছে সাজো সাজো রব।

বাঙালিদের সবচাইতে বড় উৎসব দুর্গা পুজো আমাদের দোরে কড়া নাড়ছে। মা আসছেন এক বছর পর, তাই পুজোর সাজগোজের ক্ষেত্রে দিতে হবে বাড়তি নজর। বাঙালিরা তাদের শপিং ইতিমধ্যে বেশিরভাগই সেরে ফেলেছেন। সামান্য কিছু বাকি থাকতে পারে। যেমন ব্যাগ, ম্যাচিং জাঙ্ক জুয়েলারি। আজকাল এটার ট্রেন্ড চলছে, এটা দেখতেও ভাল লাগে। তবে কোনটা আপনাকে মানাবে সেটার দিকে নজর দেবেন। কারণ ট্রেন্ডের সাথে পা মেলাতে গিয়ে আপনার সৌন্দর্যের খামতি না ঘটে। শারদীয়া সাজে নিজেকে আলাদা করতে সবাই চায়। পুজোর সাজ পুজোর আমেজটাকে আলাদা আলাদা রঙে বেছে নেওয়া যেতে পারে। পাঁচ দিনের পাঁচ রকম সাজ, এটা নিয়ে পরে আলোচনা করব। এখন আলোচনা করব পুজোর সাজের আগাম প্রস্তুতি। পুজোর ১০/১২ দিন আগে থেকে আপনারা চুল কাটতে পারেন, কারণ এটা সেট হতে সময় লাগে। যদি স্বাস্থ্য উজ্জ্বল ও বড় চুল থাকে তবে চুলকে না কেটেই পুজোর জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। যেমন লম্বা চুলে স্ট্রিকিং কালার করতে পারেন, গ্লোবাল কালার করতে পারেন। এছাড়া হেয়ার স্পা করতে পারবেন। বড় চুলে ফ্রন্ট গ্র্যাজুয়েশান অথবা লেয়ার কাটতে পারেন। ছোট চুলে গ্র্যাজুয়েটেড বব, ব্লান্ট, মাশরুম, পিসি কাট, আরও নানারকম কাট আছে যা আপনি করতে পারেন।

স্ট্রিকিং আজকাল ব্লন্ড, গ্রিন, ব্লু, পিঙ্ক নানা রকম রঙে করা যায়। অবশ্যই কোনও বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী করুন, কারণ কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে অনেক হেরফের থাকে। চুল কম থাকলে পার্মিং করতে পারেন। যদি চুল খুব ফোলা থাকে তবে স্ট্রেইটেনিং, স্মুথনিং, রিবন্ডিং করতে পারেন। এতে মেকওভার হবে। এটা ১৫/১৬ দিন আগে করবেন। চুলে স্পা, ফেসিয়াল, থ্রেডিং, ম্যানিকিওর, পেডিকিওর পুজোর ৩/৪ দিন আগে করবেন। পুজোর শপিং করতে গিয়ে মুখে, পায়ে, হাতে, পিঠে ট্যান পরেছে— তার জন্য চাই তিন-চার দিনের পরিচর্যা। যা আপনাকে পুজোয় করে তুলবে মনমোহিনী, এছাড়া পুজোর পাঁচ দিন পাঁচরকম ভাবে দিনে ও রাতে নিজেকে কীভাবে তৈরি করবেন সেটা নিয়ে পরের পর্বে আলোচনায় আসব।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

বই পত্রের ডুয়ার্স

ছোট ছোট গল্প

সুজয় চক্রবর্তী এবং শাঁওলি দে-র যৌথ অণুগল্পের সংকলনে মোট ৬০টি গল্প রয়েছে। দু'জনের যথাক্রমে ৩১ ও ২৯টি

অণুগল্প। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে অণুগল্প রচনার জোয়ার এসেছে। স্বল্প পরিসরে গল্পের আমেজ আনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় গল্প বিশ্ব জুড়েই চর্চিত বর্তমানে। অবশ্য অনেকেই মনে করে থাকেন যে, অণুগল্প আসলে গল্পের সম্ভাবনাকে খুন করে। আমরা অবশ্য এ নিয়ে বিতর্কে যেতে চাই না।

সুজয়বাবুর গল্পগুলিতে অতি সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের যন্ত্রণা ও বঞ্চনার ছবি পাওয়া যায়। লেখালেখির মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রতিবেদনের ছাপ রয়েছে। পড়তে গিয়ে কখনও একটুও খটকাও লাগে। 'পাগলি ও একটি স্বপ্নপূরণ' গল্পের প্রসবের পর মৃত পাগলির সন্তানকে কালু মিত্তির থানায় আবেদন জানিয়ে পেয়ে গেলেন কীভাবে? 'অর্বাচীন নেপোদের গল্প'-এ লিটল ম্যাগাজিনের কবি সুবিমল রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্যগ্রন্থ বইমেলায় 'হট কেক' হল। এটাও আরোপিত মনে হয়েছে। তুলনায় 'সাধনার ফল' কিংবা 'রুটি' ভাল লেখা। অণুগল্পের আমেজ আনে।

শাঁওলি দে-র গল্পগুলিতে মুখ্যত লেখিকার রোমান্টিক মনের প্রকাশ ঘটেছে। 'আধুনিকতা ও একটি অবিশ্বাসের গল্প', 'প্রশ্ন', 'ইঁদুর কল' ভাল গল্প। বস্তুত, অণুগল্পে অনুভব বৈচিত্র থাকা জরুরি। শাঁওলির লেখায় তার কিছুটা অভাব রয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গল্পই প্রকৃত ছোটগল্পের দাবি রাখে। যেমন 'শাস্তি' গল্পটি। একটি যথার্থ ছোটগল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটি এ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অণুগল্পে 'গল্প' জরুরি নয়। আবার অণুগল্প, মানে গল্পের সংক্ষিপ্তসারও নয়। সুজয় এবং শাঁওলি এই বিষয়গুলি মাথায় রাখলে যথার্থ অণুগল্প লিখতে পারবেন বলে বিশ্বাস। কারণ উভয়ের মধ্যেই পর্যবেক্ষণ ও অনুভব রয়েছে। তবুও সবিনয়ে বলতে চাই যে, লেখকদ্বয় ছোটগল্পে মন দিলে আগামীতে পাঠকের খুশি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে।

শ্যামল জানার প্রচ্ছদটি মন্দ হয়নি।

দুই দুগুণে এক। সুজয় চক্রবর্তী, শাঁওলি দে। ইস্ক্রা। কলকাতা- ১১৮। ৭৫ টাকা।

রজত অধিকারী

ওঁ মণি পদ্মে হুম

এক দুর্গম অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি আছে এই স্বল্পায়তন বইটিতে। পর্বতারোহী বা ভ্রমণ বিষয়ক লেখক হিসেবে বাংলা পাঠকসমাজে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি কতটা, সে বিষয়ে অবগত না হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি পাহাড় ভালবাসেন, দুর্গম পথের হাতছানি ভালবাসেন। আর বাসেন পার্বত্য উপত্যকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লাবণ্য, যার জেরে সত্যিই মনে হয়, জীবন তুচ্ছ করে ছুটে যাওয়া— বিপদকে আঙুলে নাচানোই শ্রেয় ইহজগতে। যাঁরা ভ্রমণপিপাসা নিয়ে জন্মেছেন, তাঁদের শীঘ্রই এই বই সংগ্রহ করে পড়ে ফেলা উচিত। না হলে পাঠক, আপনি ঠকবেন। প্রথমেই বলেছি এ বই স্বল্পায়তন। মাত্র ২৯ পাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প যাত্রাপথে ২০১৫ সালে ভূমিকম্পের আগে ও পরের রোজনামচা। সৌরভবাবুর বয়ানে এ ডায়েরি পড়তে পড়তে সত্যিই পৌঁছে যাওয়া যায় হিমালয় রেঞ্জের সেইসব অঞ্চলে— নামচে বাজার, থ্যাংবোচে মনাস্ট্রি, চুকাং ভ্যালি, লুকলা ও আরও বিভিন্ন ছোট-বড় স্থান, যা যাত্রাপথের মাইলফলক। আর আছে গুরাস ও রডোডেনড্রনের মধুময় শোভা। লেখক তাঁর বইয়ের শুরুতেই লিখেছেন, 'এই নিয়ে চতুর্থবার নেপাল যাত্রার আয়োজন শুরু করেছি।' মানে পূর্বে আরও তিনবার এসেছেন, এবং একজন প্রকৃত ভ্রমণকারীর মতো তাঁরও পিপাসা মেটেনি— পুরনো হয়নি হিমালয়। সে চিরনতুন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এক উপন্যাসে বলেছিলেন, 'আকাশ কোনও দিন পুরনো হয় না।' হিমালয়ও কোনও দিন পুরনো হবে না। গ্রন্থের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনের কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, তা হল ছবি। নামচে বাজার, থ্যাংবোচে মনাস্ট্রি, চুকাং ভ্যালি থেকে তোবোচে, আমাদাবালাম পর্বতশৃঙ্গ, থামসেরকু, এভারেস্ট শৃঙ্গর যে অপূর্ব দৃশ্যগুলি লেখক ক্যামেরাবন্দি করেছেন, তার সমন্বয় পাঠককে আরও পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে সেইসব স্থানে।

লেখক তাঁর দিনলিপির শিরোনাম অর্থাৎ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'সাগর মাথায় ভূ-চালের শিহরন'। সত্যিই শিহরন ফেলে যায় এইসব দুর্গম অঞ্চলের বিস্তৃত বর্ণনায়। সৌরভবাবুর এই ট্রেকিং-এর সঙ্গী কৃষ্ণেন্দু এক স্থানে বলেছেন, 'তুমি সঙ্গে থাকলে হাঁটার জন্য সব থেকে যেটা প্রয়োজন, সেটা পাহাড়ের প্রতি ভালবাসা।' এই ভালবাসাই অত্যন্ত সুললিত গদ্যের ঝকঝকে মুনশিয়ানায় পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

বেস ক্যাম্প যাত্রাকালীন সৌরভ ও কৃষ্ণেন্দু নামচের পূর্ব দিকে কিছুটা চড়াই অতিক্রম করে বিখ্যাত তেনজিং মিউজিয়ামে পৌঁছান। তেনজিং নোরগের অপূর্ব মর্মরের সামনে দাঁড়ালেই এভারেস্ট, লোৎ সে, আবাদাবালামের অবাধ দৃশ্যপর্ব। মূর্তির পাশেই দু'টি ছোট পাথরের পাশাপাশি অবস্থান। লেখক বলেছেন, 'কৌতূহলী হয়ে দেখলাম, একটি পাথর বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ এভারেস্ট থেকে আনা— অন্য

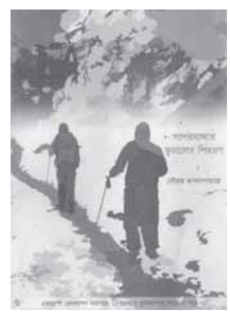

আরেকটি বিশ্বের সর্বনিম্ন স্থান অর্থাৎ ইজরায়েলের 'ডেড সি' থেকে আনা। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে গেল— কী করিয়া মিলন হল দোঁহে কী ছিল বিধাতার মনে।' এত চমৎকার ও বাস্তব উপমা প্রয়োগ বিস্মিত করে দেয়। তবে আমার মনে হয়, এখানে টেকনিক্যালি ত্রুটি রয়েছে। যদ্দূর জানি, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থান প্রশান্ত মহাসাগরের 'মারিয়ানা খাদ'। যাক সে কথা। এর পর ২৫ এপ্রিলের দিনলিপি থেকে শুরু হচ্ছে নেপাল ভূমিকম্পের বিভীষিকাময় দিনগুলি। সমস্ত সৌন্দর্য তছনছ হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে। মুহুর্মুহু খবর আসছে কাঠমান্ডুতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির। সে এক আতঙ্কগ্রস্ত প্রহর। সৌরভ এখানে লিখেছেন ওঁর জীবনের প্রথম শিহরন। কীভাবে বেঁচে থাকাকেও কখনও কখনও আশ্চর্যের বলে মনে হয়। তাঁরা যে বেঁচে ফিরেছেন— এই জন্য হিমালয়ের কাছে চিরঋণী তাঁরা। হিমালয়, তুমিই সবচাইতে সুন্দর। তুমিই শেষ পর্যন্ত 'ওঁ মণি পদ্মে হুম'। অমিতশরণ কৃত প্রচ্ছদ বিষয়ানুগ।

সাগর মাথায় ভূ-চালের শিহরন। সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন বাংলা কবিতার কাগজের উদ্যোগ। জলপাইগুড়ি। ৫০ টাকা।

রঞ্জন রায়

ডাক্তারের ড্রয়ার্স

আপনার বাড়ির বাচ্চাটির দৃষ্টিশক্তি কি দুর্বল মনে হচ্ছে?

ক্ষীণদৃষ্টি (Amblyopia) বলতে কী বোঝায়?

চোখের কোনও বিশেষ রোগ ছাড়াই এবং চোখের Anatomy বা গঠনের কোনও বিকার (Structural abnormality) ছাড়াই যখন দৃষ্টি কম হয়— সেই বিশেষ পরিস্থিতিকেই (functional status) Amblyopia বা ক্ষীণদৃষ্টি বলে। সাধারণভাবে একে 'অলস চোখ' বা Lazy Eye-ও বলা হয়।

ক্ষীণদৃষ্টি: কীভাবে এমন ঘটে?

ক্ষীণদৃষ্টি চোখের স্বাভাবিক কার্যকরী দেখার ক্ষমতা ঠিকমতো তৈরি হয়ে উঠতে পারে না সেই কচিকাঁচা শিশু বয়সের শুরু থেকে। ব্রেন বা মাথার অংশ যা দেখতে সাহায্য করে, তার গঠন সম্পূর্ণ হয় প্রায় চার বছর বয়সে। এই গঠন সম্পূর্ণ হবার আগে যদি দুর্বল চোখের পর্দা বা রেটিনা থেকে পরিষ্কার ছবি (clear image) মস্তিকে ঠিকমতো না পৌঁছায় তবে পরবর্তী কালে গঠন সম্পূর্ণ হলেও ভাল দেখার ক্ষমতা সেই দুর্বল চোখে সম্ভব হয় না। এইভাবেই অলস চোখ বা Amblypic eye তৈরি হয়।

যেসব কারণে ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে থাকে

—দুই চোখের পাওয়ারের মাত্রাতিরিক্ত তফাৎ (marked difference)।
—ট্যারা বা তির্যক চোখ (squint)।
—জন্মগত ছানি (congenital cataract), ঝুলে পড়া চোখের পাতা (Droopy eyelids) ইত্যাদি।

চিকিৎসার সুফল নির্ভর করে যে সকল বিষয়ের উপর সেগুলি হল:

১) তাড়াতাড়ি সমস্যাটাকে ধরতে পারা ও তার আসল কারণ খুঁজে বের করা (Early detection and pointing the root cause)।
২) ক্ষীণদৃষ্টির গভীরতা (Severity of amblyopia) অর্থাৎ সমস্যাটি কত বেশি জটিল...।
৩) চিকিৎসার শুরুতে শিশুটির বয়স (age at the onset of treatment)।
৪) চিকিৎসায় শিশুটির ও তার মা-বাবা, পরিবারবর্গ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতা।

যদি সমস্যাটিকে কমবয়সে তাড়াতাড়ি ধরতে পারা যায় তাহলে

—চিকিৎসা সফল হবার সম্ভাবনাও বেশি এবং
—অনেক কম সময়েই চিকিৎসা শেষ করা যায়।
চার বছর বয়সের পরে ক্ষীণদৃষ্টির সমস্যা ধরা পড়লে দৃষ্টির উন্নতির সম্ভাবনা তুলনায় কম।

যেহেতু কম বয়সে শিশুরা নিজেরা দৃষ্টিগত অসুবিধার কথা বলতে পারে না, তাই গৃহচিকিৎসক (Family physician), শিশু বিশেষজ্ঞ (child specialist) বা চোখের ডাক্তার (eye specialist) দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত তিন বছর বয়সের আগেই।
চিকিৎসা
—দেখার উন্নতির জন্য শিশুটিকে তুলনায় বেশি দুর্বল চোখটি ব্যবহারের জন্য বাধ্য করতে হবে। এইভাবেই দুর্বল চোখের স্নায়ু বা নার্ভ সতেজ হয় এবং ধীরে ধীরে বেশি ভাল দৃষ্টি তৈরি হয়।
—এই পদ্ধতিটি সহজ। এর জন্য অন্য চোখটিকে অর্থাৎ তুলনায় সবল চোখটিকে বন্ধ রেখে (patching বা covering the better eye) দুর্বল চোখটি দিয়ে দেখার যাবতীয় কাজ করতে হয়। এইভাবে এক একটি চোখকে নির্দিষ্ট সময় ধরে (one at a time) বা পর্যায়ক্রমে দুটি চোখকেই (alternately either eye) বন্ধ করে রেখে বেশ কয়েক মাস ধরে এই চিকিৎসা চালানো দরকার হতে পারে।

যত তাড়াতাড়ি ও যত কম বয়সে এই চিকিৎসা শুরু করা যায়, ভাল দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি।

চিকিৎসা শুরুতে দেরি হলে, চিকিৎসায় অবহেলা হলে বা সঠিক চিকিৎসা না দিলে দৃষ্টির উন্নতির সম্ভাবনা কমে যায়।

কীভাবে উন্নতি হয়?

তুলনায় সবল চোখটি বন্ধ রেখে, দুর্বল চোখে দেখার কাজ করার সময় পর্যাপ্ত আলোতে, মন দিয়ে ছবি আঁকা, ছবিতে রং করা, হাতের লেখা অভ্যাস করা, সুক্ষ্ম লেখা, বর্ণ বা অক্ষর পড়ার চেষ্টা করা, টিভিতে কার্টুন দেখা ইত্যাদি, চোখের যাবতীয় সুক্ষ্ম কাজ বিশেষ করে কাছের থেকে দেখতে হয় এমন কাজ ইত্যাদির মাধ্যমেই স্নায়ুর বা নার্ভের দুর্বলতা কাটানো যায়।

ডা. অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌজন্যে দিশা আই হাসপাতালের মুখপত্র 'সুস্থ দিশা'

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-6 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

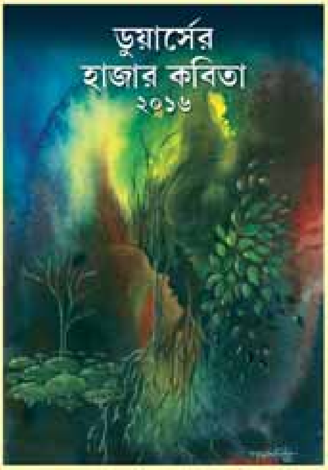

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা ২০১৬ মূল্য ৫০০ টাকা।

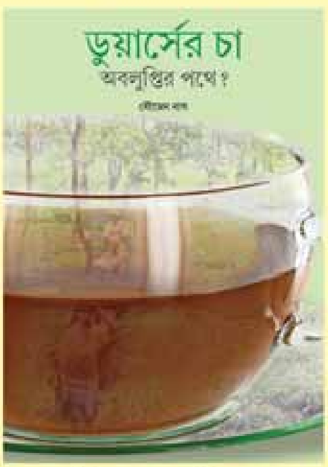

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস মূল্য ২৫০ টাকা।

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

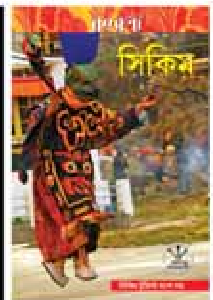

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ। মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

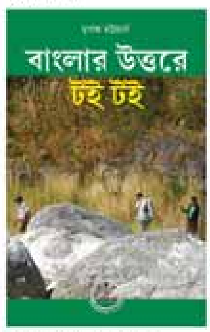

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

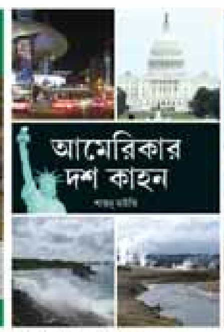

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

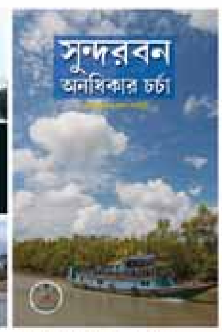

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

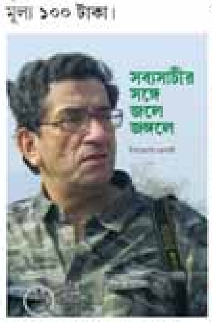

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.